বালির বাঁধ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

আর, এইচ্, শ্রীমানী এণ্ড সন্স
২০৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
চৈত্র—১৩৪১

বালির বাঁধ

বিমান

ডাক্তারী নাকি একটা মহৎ ব্যবসা, পরের কল্যাণই এর লক্ষ্য! এই রঙীন কথাটা কোন চতুর ব্যক্তি প্রথম প্রচার করেছিল, জানি না,—কিন্তু লোকের রোগ কামনা করাই যাদের স্বার্থ, সহরের স্বাস্থ্য ভাল থাকলে যাদের মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে, তাদের বৃত্তির উপর আমার আর কোন মোহ নাই। উকীল এটর্ণীদের অনেক নিন্দা শুনতে পাই, কিন্তু উকীল এটর্ণীদের সঙ্গে ডাক্তারদের একটা বড় রকমের মিল নাই কি?

ভাগ্যে, বাবা মা ছেলেবেলাতেই একটী রাঙা টুকটুকে বৌ গলায় ঝুলিয়ে দেন নি, আমি একমাত্র ছেলে হলেও এ লোভ তাঁরা সম্বরণ করেছিলেন। নতুবা পুত্রকন্যার প্রবল বন্যায় এতদিনে কোথায় ভেসে যেতাম কে জানে!

বাড়ীতে একাই থাকি। বাবার আমলের এক বুড়ো মৈথিল ব্রাহ্মণ, একাধারে আমার পাচক ও গৃহরক্ষী। বাবার মৃত্যুর পর থেকে মা তীর্থে তীর্থেই ঘোরেন, মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে দুই এক মাসের বেশী আমার কাছে থাকতে চান না। বেশ-ভূষা যথা-

সম্ভব সংক্ষেপ করে এনেছি, রাত্রে পায়জামা পরি, দিনে পেন্টালুন পরে কাটাই। মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সময় যে কোটটা গায়ে দিতাম, তাই দিয়ে এখনও কাজ চালাই। আহারের ব্যবস্থাটাও সংক্ষেপ করবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বুড়ো বামুনটাকে এঁটে ওঠা দায়। সেদিকে কোন ইঙ্গিত করলেই, সে জিভ কেটে বলে, সে আমি পারব না খোকাবাবু,—মাইজী ফিরে এসে যখন বলবেন, মিছির—তুমি থাকতে খোকা ভাল করে দুটী খেতে পেত না, শরীরটা তার রোগা হয়ে গেছে, তখন লজ্জায় যে আমি মুখ তুলতে পারব না। বুঝতাম তার ব্যথা কোথায়! সুতরাং ওদিকটায় আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটী করতাম না।

এক একবার সমস্ত দুনিয়ার উপর বিরক্ত হয়ে ভাবতাম, কাজ কি এসব ঝকমারিতে, লোটা কম্বল নিয়ে হিমালয়ের দিকে পাড়ি দিই; কিন্তু তখনই মনে পড়ত, একদল রামাত সন্ন্যাসীর কথা। আমারই বাড়ীর সম্মুখে একটা ধরমশালায় কিছুদিন পূর্ব্বে তারা আড্ডা করেছিল। সন্ন্যাসী হয়েও যদি ওদেরই মত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘি-আটার সন্ধানে ব্যস্ত থাকতে হয়, তবে আর লাভটা কি হল? ওর চেয়ে মেছোপটেমিয়ায় যাওয়াও ভাল!

আজ সকাল বেলা উঠে আকাশের দিকে চেয়ে মনটা কেমন প্রসন্নতায় ভরে গেল। নির্ম্মল আকাশ, কোথাও মেঘের কণা মাত্র নাই, দিগন্তপ্রসারিত গভীর নীলিমার মধ্যে দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে

মনও কেমন হারিয়ে যায়। বাতাস আজ কোথা থেকে যেন আনন্দের বার্ত্তা বয়ে আনছে, তার স্পর্শে সব গ্লানি অবসাদ দূর হয়ে কি এক নূতন আশা প্রাণে জাগছে। ভাবলাম, রোগী না হোক ক্ষতি নাই, ওই নীল আকাশের সৌন্দর্য্যই আজ নয়ন মন ভরে পান করি, মৃদুমন্দ বাতাসে কল্পনার পাল উড়িয়ে অজানিত দেশে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বের হই।

মিছির এসে আমার এই সুখস্বপ্নে বাধা দিয়ে বলল,—খোকাবাবু, আজ যে ঘরে—

বিরক্ত হয়ে বললাম,—কিছুই নাই,—এই তো! চুলোয় যাক, আজ আর হাঁড়ি চড়িয়ে কাজ নেই।

মিছির আমার বিরক্তি উপেক্ষা করেও ধীরে ধীরে বলল, কিন্তু এ সব না হলেও তো চলবে না, খোকা বাবু!

হঠাৎ চটে গিয়ে বললাম, না চলুক তাতে আমার কি? এখন যাও সামনে থেকে, তোমার ওই খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখ আমি দেখতে চাই না। নাপিত ডেকে দাড়িটাও কামাতে পার না?

মিছিরের মুখের ভাব দেখে বুঝলাম, সে বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছে; —হয়ত বা ভাবছে, খোকাবাবুর মাথা বিগড়ে গেল নাকি! আর কোন উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে সে ভিতরের দিকে চলে গেল।

বড় অনুতাপ হল। আহা ওই বুড়ো বামুনের দোষ কি! ওতো আমার ভালর জন্যই চেষ্টা করে। একবার ইচ্ছা হল, ওকে ডেকে দুটো মিষ্টি কথা বলি। কিন্তু ততক্ষণে সে অদৃশ্য হয়েছে।

মনটাকে জোর করে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বৃথাই চেষ্টা

করছিলাম,—এমন সময় নারীকণ্ঠে প্রশ্ন হল—অতি কোমল অতি মধুর সে কণ্ঠস্বর—ডাক্তার বাবু আছেন ?

চমকে ফিরে দেখলাম,—দ্বারপ্রান্তে একটী নারীমূর্ত্তি, তার এক পা দরজার এ পাশে, আর এক পা বাহিরে। বিদ্যুৎ-লতার সঙ্গে দেহের বর্ণের উপমা যে এমন বাস্তব সত্য হতে পারে, তা পূর্ব্বে কল্পনা করিনি। একখানি মলিন শাড়ীতে তার গৌর তনু আচ্ছাদিত, রূপ যেন তার বাধা মানতে চাইছে না। সুদীর্ঘ কেশদাম এলায়িত, কতকাল বুঝি তাতে কবরী বাঁধা হয় নি। বড় বড় চোখ দুটীর দৃষ্টি উদ্বেগ-ব্যাকুল, সমস্ত মুখে একটা বিষাদ ও উৎকণ্ঠার ছায়া। তবু মনে হল, এমন অনিন্দ্যসুন্দর মুখ বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে দেখিনি...

কতক্ষণ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে ছিলাম জানি না,—তার অধর-কোণে মৃদু হাসির রেখা দেখে আমার চমক ভাঙ্গল। অপ্রতিভ হয়ে বললাম,—হাঁ, আমিই ডাক্তারবাবু, কি চাই আপনার ?

মেয়েটী ঘরের ভিতরে এসে ছোট একটী নমস্কার করে বলল,—বড় বিপদ ডাক্তারবাবু,—একবার আমাদের বাড়ীতে যাবেন ? বেশীদূর নয়, তিনটে গলি পার হয়েই ওই মোড়ের বাড়ীটা—

দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে প্রশ্ন করলাম,—কিন্তু—ব্যারামটা কি ?

মেয়েটী তার বড় বড় দুই চোখের নিঃসঙ্কোচ সরল দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে বলল,—তাতো জানিনে। আপনি ডাক্তার, আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন না কি ?

মনে কেমন সন্দেহ হল, মাথার কোন ছিট নাই তো ? পুনর্ব্বার প্রশ্ন করলাম,—ব্যারাম আপনার ছেলের ?

এবার সে অধীর ভাবে বলল,—না, না, ছেলে নয়, ছেলে আমার নেই,—স্বামী—আমার স্বামীর বড় ব্যারাম—

তাইতো শেষকালে কি পাগলের পাল্লায় পড়লাম !

সে আমার দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখে বলল,—যাবেন না আপনি ? বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা ? কিন্তু আমি সত্যি করে বলছি,—এর চেয়ে নিষ্ঠুর সত্য আর নেই,—আমার স্বামী মরণাপন্ন !

আমি তবুও কোন উত্তর দিলাম না,—অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করতে লাগলাম।

মেয়েটী এবার ব্যাকুলস্বরে বলল,—যেতেই হবে ডাক্তারবাবু আপনাকে,—নইলে আমার স্বামী বাঁচবেন না !

কি বিপদেই পড়া গেল !···কিন্তু সত্যিও তো হতে পারে—বিপদে পড়লে স্বাভাবিক মানুষের মনও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। চেহারা দেখে মনে হয়, কোন ভদ্রঘরের বধূ, দারিদ্র্যের কবলে পড়ে এমন দশা হয়েছে।

বললাম,—আমি আপনার স্বামীকে দেখতে যাব বিকেলের দিকে,—ঠিকানাটা বলে দিয়ে যান—

মেয়েটী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল,—আঃ, বাঁচলাম ! কিন্তু বিকালের দিকে কেন, এখনই আমার সঙ্গেই চলুন না ?

এতটা প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নয় ! একটু গম্ভীর ভাবেই বললাম—বিকালের দিকে গেলেই ঠিক হবে। আপনি এখন বাড়ী যান,—ঠিকানাটা—

মেয়েটী কয়েক মুহূর্ত্ত আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে নিঃশ্বাস ফেলে

ধীরে ধীরে বলল,—আচ্ছা, তাই যাবেন! তিনটে গলি পার হয়ে ওই মোড়ের বাড়ীটা—মিত্তিরদের বাড়ী।...

একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। পরক্ষণেই দেখলাম, তরুণী অদৃশ্য, যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল! একি স্বপ্ন, না মায়া, না আমারই মনের ভ্রম? কিন্তু স্বপ্ন বা মায়া যে নয়, শীঘ্রই তার প্রমাণ পেলাম। মিছির এসে প্রশ্ন করল,—কে এসেছিল খোকাবাবু?

মিছিরের মুখের দিকে চেয়ে মনে হল, যেটুকু সে মুখে বলেছে, তার চেয়ে অনেকখানি বেশী মনে মনে সে ভেবে নিয়েছে। একটু রুক্ষ স্বরেই বললাম,—সে খবরে তোমার কাজ কি মিছির-জী?

পরক্ষণেই এই অনাবশ্যক উত্তেজনার জন্য নিজেই লজ্জিত হয়ে বললাম,—ওর স্বামীর খুব ব্যারাম, ডাক্তার ডাকতে এসেছিল।

মিছিরের ভাব দেখে বোধ হল, কথাটা সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নি। ভিতরের দিকে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল,—বেলা তো কম হয় নি, এইবার স্নান করে নাও।

*

*   *

সমস্ত দুপুর বেলাটা উৎকণ্ঠায় কাটল। সময় যেন আর কিছুতেই যেতে চায় না। মনে মনে একটু অনুশোচনা হল, কেন বিকালবেলা যাব বলে দিলাম। এখনই বের হয়ে পড়লে ক্ষতি কি? কিন্তু সে যে অত্যন্ত অশোভন হবে, মেয়েটী না জানি কি মনে করবে! ডাক্তারের পক্ষে এতটা অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করা ঠিক নয়। এদিকে গাড়ীটাও বিকালের দিকে আসতে বলে দিয়েছি।...

চুলোয় যাক, একখানা মেডিক্যাল জার্ণাল নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করে দিলাম।...কি বৈষম্য ও অবিচার! বড় বড় পসারওয়ালা ডাক্তারদের তো রোগী দেখবার ফুরসৎই হয় না, তিনদিন আগে খবর দিতে হয়। আর আমি একটি মাত্র রোগী দেখবার জন্য ঘড়ির কাঁটা লক্ষ্য করে বসে আছি!

যাহোক, সময়টা অবশেষে কোন রকমে কেটে গেল, মোটরও এসে পড়ল।

তিনটি গলি পার হয়ে মোড়ে মিত্তিরদের বাড়ী। জন্মাবধি এই

পাড়াতেই আছি, কখনও তো এ বাড়ী লক্ষ্য করিনি। একটা অতি পুরাতন প্রকাণ্ড চকমিলানো বাড়ী, সম্ভবতঃ মান্ধাতার আমলে তৈরী হয়েছিল। দেয়ালের বালি চূণ কবে খসে পড়ে গিয়েছে তার ঠিকানা নাই, জানলার কাঠের গরাদগুলি ভাঙ্গা, যে দু'একটা আছে, তাও নড়বড় করছে। ছাদের উপর কয়েকটা অশ্বত্থ গাছের চারা বেশ কায়েমীভাবে ইজারা নিয়েছে। বাড়ীর চারিদিকের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ছে। সম্মুখে খানিকটা খালি জায়গা, জঞ্জাল ও আগাছায় পূর্ণ। দেখলেই মনে হয়, পোড়ো বাড়ী, এখানে যে মানুষ বাস করে বা মানুষের গতিবিধি আছে, তা কল্পনাই কর' যায় না। কলিকাতা সহরে এখনও এমন বাড়ী আছে, এই আশ্চর্য্য !

ঠিক এই বাড়ীটাই কিনা কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি ! রাস্তা দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিল, মনে হল, এই পাড়ারই লোক। মোটর থামিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—এটা কি মিত্তিরদের বাড়ী ?

লোকটি ঈষৎ বিস্মিত ভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল—'জানিনা',—তার পর আর দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রতীক্ষা না করে হন হন করে চলে গেল।

মোটর থেকে নামলাম, ভাঙ্গা বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এখন কি করা যায় ! বাড়ীর কোথাও তো জনমানবের চিহ্ন দেখছি নে। সাহস করে ভিতরে ঢুকে পড়ব কি ? না, ফিরে যাব ? সমস্ত ব্যাপারটাই আগাগোড়া একটা ধাপ্পাবাজী নয় তো ? খবরের কাগজে পড়েছিলাম, একদল গুণ্ডা এই ভাবে লোককে প্রলুব্ধ করে পোড়ো বাড়ীতে নিয়ে যায়, তারপর তার সর্ব্বস্ব লুঠ করে। এও কি তেমনি কোন গুণ্ডার দলের কাণ্ড ? অসম্ভব নয় ! না ; ফিরে

যাওয়াই ঠিক ! মনে বড় দুঃখ হল, যদিই বা একটা 'কল' পেলাম, তারও শেষ পর্য্যন্ত এই দশা ?......

কিন্তু মেয়েটির চেহারা এখনো তো আমার চোখের উপর ভাসছে। সে যে মিথ্যা বলেছিল, এ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। গুণ্ডার দলেও স্ত্রীলোক চর থাকে বটে, ...না, না,—সে কিছুতেই তেমন হীন কাজ করতে পারে না। সেই উদ্বেগব্যাকুল দৃষ্টি, বিষণ্ণমলিন মুখ, –এতটা প্রতারণা, কৃত্রিম অভিনয় কখনো তার দ্বারা সম্ভব নয় !...

মোটরে উঠব কিনা ইতস্ততঃ করছি,—এমন সময় দেখলাম একটা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সেই নারী মূর্ত্তি। আমাকে দেখে তার মুখ যেন এক অদ্ভুত হাসিতে ভরে উঠল। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ভিতরে যাবার জন্য সে আহ্বান করল। মনে যুগপৎ সংশয় ও আশঙ্কার উদয় হল। এই নারীকে বিশ্বাস করে জনমানবহীন পোড়ো বাড়ীটার ভিতরে যাওয়া ঠিক কি ? পরক্ষণেই নিজের অকারণ ভীতি ও কাপুরুষতার জন্য ঘৃণা হল। এত ভয় যার, সে ডাক্তারী করবে কি করে ! সামান্য একটী নারীকে দেখে ভয় কি ? রোগী দেখতে এসে একটা কল্পিত ভয়ে ফিরে যাওয়া, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নের মতই হীন কাজ ! পুনর্ব্বার চেয়ে দেখলাম, তরুণী ততক্ষণে জানলা থেকে সরে গিয়েছে। আর কোন দ্বিধা না করে দৃঢ় পদক্ষেপে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলাম।

বাইরের বারান্দা পার হয়ে দেখি, দ্বারপ্রান্তে তরুণী দাঁড়িয়ে,—মাথায় কাপড় নাই, এলায়িত কেশের রাশি সমস্ত পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। দু'হাত কপালে জুড়ে নমস্কার করে সে বলল,—আসুন ডাক্তার বাবু, আমি ভাবছিলাম, আপনি আর এলেন না !

ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে বললাম, ডাক্তার কি 'কল' নিয়ে না এসে পারে ?

তরুণী মৃদু হেসে বলল, আপনার অসীম দয়া ! কিন্তু বাড়ী খুঁজে বের করতে বোধহয় কষ্ট হয়েছিল ?

—হাঁ, তা একটু হয়েছিল বটে !

—হবারই কথা। আজ তো কেউ আমাদের চেনে না—বলে সে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

—যাক সে কথা, আপনি এই ঘরটায় একটু বসুন, আমি রোগীকে খবর দিই—

বলে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে পাশের একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে সে লঘুপদে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, অপরাহ্ণেই সেখানে অন্ধকার জমে উঠেছে। আমার পদশব্দ পেয়ে কতকগুলা চামচিকা উড়ে পালাল। একটা বিশ্রী ভাপসা গন্ধ! বোধহয় কতকাল হল ঘরটি জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। সেই অন্ধকারের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম, দেয়ালগুলি নানা জায়গায় ফেটে গেছে, মেজের চূণ শুরকী উঠে ইঁদুরের গর্ত্ত হয়েছে। ঘরে আসবাব পত্র কিছুই নাই, কেবল এক পাশে একখানা জীর্ণ খাট। আর এক কোণে একখানা ভগ্নদশাগ্রস্ত আরাম কেদারা। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অগত্যা সেই জীর্ণ আরাম কেদারাটাতেই কোন মতে বসে পড়লাম।…

সমস্ত বাড়ীটা নীরব নিস্তব্ধ, সামান্য একটু শব্দও শোনা যায় না। অন্ধকার যেন চারদিক থেকে দুঃস্বপ্নের মত বাড়ীটাকে গ্রাস করে

ফেলছে। মনে হল, সেই দুঃস্বপ্ন যেন ক্রমে ক্রমে আমারও বুকে চেপে বসছে।

...মেয়েটি এতক্ষণও আসে না কেন—মতলব কি তার? না, এমন জায়গায় এসে ভাল কাজ করি নি। ঠিক করলাম যে মেয়েটী যদি আর দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে না আসে, তবে চলে যাব।

কতক্ষণ এমনি প্রতীক্ষায় সময় কেটেছিল জানি না,—সহসা তার কণ্ঠস্বর কাণে এল,—অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি ডাক্তার বাবু,—ক্ষমা করবেন! এইবার রোগী দেখতে চলুন—

মন্ত্রমুগ্ধবৎ উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল, আমি তার অনুসরণ করলাম। এর মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকার বাড়ীর ভিতরটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, অথচ সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটার মধ্যে কোথাও আলো নাই। ঘরের পর ঘর নিঃস্তব্ধে পার হচ্ছি, একটী বড় হলও পার হলাম। অন্ধকারে তরুণীর চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না,—মনে হচ্ছিল, যেন প্রেতপুরীতে কোন ছায়া-মূর্ত্তি, আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে চলেছে!

এক জায়গায় এসে সে থামল, আমিও গতিবেগ সহসা সংযত করতে না পেরে তার খুব কাছে গিয়ে পড়লাম। তার নিঃশ্বাস আমার গায়ে এসে লাগল, অঞ্চলপ্রান্ত, এলায়িত কেশের গুচ্ছ আমার বাহু-মূল স্পর্শ করল। নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি একটু সরে দাঁড়ালাম, কিন্তু তরুণীর সে দিকে কোন খেয়ালই ছিল না।

মৃদু কণ্ঠে সে বলল,—এইবার আপনার একটু কষ্ট হবে, অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারবেন না—

কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব জোর দিয়ে বললাম,—কেন পারব না?

—না, আপনি পারবেন না। একে এই অন্ধকার, তার উপর অজানা সিঁড়ি। আপনি আমার হাত ধরুন—

সসঙ্কোচে বললাম,—সে কি হয়!

তরুণী হেসে উঠে বলল,—এই আপনার সাহস! আমি পেত্নী নই, আপনার ঘাড় মটকাবো না—বলে সে আমার দিকে তার ডান হাত বাড়িয়ে দিল।

আমি তবুও ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। সে পুনর্ব্বার বলল,—অন্ধকার সিঁড়ি থেকে পড়ে যদি পা ভেঙ্গে যায়, তবে রোগীও দেখতে পারবেন না, আমাকেও বিপদে ফেলবেন!

যুক্তি অকাট্য! অগত্যা তার হাতখানা ধরতে হল। ফুলের মত কোমল হাত! যন্ত্রচালিতবৎ আমি তার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। মনে হল, কোন দুর্গম পাহাড়ে উঠছি, পথের আর শেষ নাই।

দোতালায় উঠে সে আমার হাত ছেড়ে দিল। তার পর একটা ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিম্ন স্বরে বলল,—চলুন।

ঘরখানি প্রশস্ত, এক কালে নিশ্চয়ই সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন ছিল, কিন্তু এখন জীর্ণ অবস্থা। এক ধারে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন মিট মিট করে জ্বলছে, সেই আলোতে দেখলাম, একখানি খাটের উপর মলিন শয্যায় শুয়ে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তার দেহ যেন শয্যার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এই রোগী তরুণীর স্বামী! পদশব্দে সে চোখ তুলে চাইল, আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই তার

মুখে ভীতি ও বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। তরুণী তার মুখের কাছে ঝুকে পড়ে নিম্নস্বরে কি যেন বলল।

রোগীর মুখে এবার বিরক্তির চিহ্ন দেখা দিল, রুক্ষস্বরে সে বলল--কে তোমাকে ডাক্তার ডাকতে বলল, টাকা দেবে কে?

মেয়েটীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। রোগীর কপালের উপর এক খানা হাত রেখে সে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করল। কিন্তু রোগী তাতে শান্ত হল না, বরং আরও উত্তেজিত ভাবে বলল—চিরকাল তুই আমাকে জ্বালিয়ে এসেছিস, এই মরণকালেও কি নিষ্কৃতি নেই!

ক্লান্তভাবে সে হাঁপাতে লাগল।

আমি বড় বিব্রত হয়ে পড়লাম, রোগী দেখতে এসে এমন বিশ্রী দম্পত্যকলহের সম্মুখীন হতে হবে, তা ভাবি নাই।

সাহসে বুক বেঁধে রোগীর কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে উনি ডাকেন নি, আমি নিজেই এসেছি, আর টাকাও আমাকে দিতে হবে না। আপনি একটু স্থির হয়ে শুয়ে থাকুন।

রোগীর মুখে ঈষৎ প্রসন্নতার চিহ্ন দেখা গেল, সে আর কোন কথা না বলে স্থির হয়ে শুয়ে রইল।

তরুণীর দিকে চাইতেই দেখলাম তার দুই চোখ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে, একটা বিষম সঙ্কট থেকে আমি যেন তাকে রক্ষা করেছি।

রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসে অনেকক্ষণ ধরে তাকে পরীক্ষা করলাম। বুঝলাম, দৌর্ব্বল্য ও রক্তহীনতাই তার প্রধান ব্যাধি। দীর্ঘকাল ধরে

দেহের উপর অত্যাচার হয়েছে, এখন আর মৃত্যুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার শক্তি তার নেই।

তবু ওঠবার সময় সান্ত্বনার স্বরে বললাম,—ভয় নেই, সেরে উঠবেন, তবে একটু সময় লাগবে।

সেই ক্ষীণ আলোকে মনে হল, রোগীর পাণ্ডুর অধরে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। তরুণীর মুখে কিন্তু কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না।

আবার সেই সিঁড়ি ভেঙ্গে নামলাম। কিন্তু এবার মেয়েটী লণ্ঠনটা সঙ্গে নিয়ে এল, তার হাত ধরতে হল না। নীচের সেই অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল—বসুন—

বললাম,—বসবার সময় নেই, ডিস্‌পেন্সারীতে গিয়ে ওষুধটা তৈরী করতে হবে।

একটু ইতস্ততঃ করে সে বলল,—আপনার ফি,—ওষুধের দাম, ডাক্তার বাবু?

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললাম,—বলেছিতো, নেবনা—

বড় বড় দুই চোখে কয়েক মুহূর্ত্ত সে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল, তারপর কম্পিত স্বরে বলল—কেন নেবেন না? নিতেই হবে—

এ 'কেন'র উত্তর দিতে না পেরে আমি নীরব হয়েই রইলাম।

তরুণী তার হাতের বালা খুলে বলল,—টাকা আমার নেই, এই অলঙ্কার বিক্রী করে নেবেন—

আমি এক পা পিছিয়ে বললাম,—সেকি! আমি আপনার বালা বিক্রী করে টাকা নেব! আমি ডাক্তার, অলঙ্কার বিক্রী করা আমার ব্যবসা নয়—

কিন্তু-

—এর মধ্যে কিন্তু কিছু নেই! আপনার স্বামী ভাল হয়ে উঠলে তিনি বরং টাকা দেবেন—

ওর মুখে করুণ হাসি ফুটে উঠল। ভারী গলায় সে বলল—মিছে আমাকে প্রবোধ দেবেন না ডাক্তারবাবু! আমি বেশ জানি, ওঁর ভাল হবার কোন আশা নেই—!

কৃত্রিম বিরক্তির সঙ্গে বললাম,—আপনিই যদি সব জানেন, তবে আর আমাকে ডাকবার দরকার ছিল কি?...আগে থেকে অমঙ্গলের কথা ভাবতে নেই!

তরুণী একটু চুপ করে থেকে ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলল,—আপনি জানেন না, ডাক্তারবাবু, এই পাঁচবৎসর—মৃত্যুর সঙ্গে আমি কিভাবে লড়াই করেছি;—কিন্তু আর যে পারি নে—!

বলে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

মুহূর্ত্তের জন্য আমার কেমন আত্মবিস্মৃতি ঘটল। নারীর অশ্রু আমি কোনদিনই সহ্য করতে পারি না। তাড়াতাড়ি তার একখানি হাত ধরে সান্ত্বনার স্বরে বললাম,—চুপ করুন, চুপ করুন, কাঁদবেন না আপনি—

আমার এই হঠকারিতায় তার মুখে কোন রাগ বা বিরক্তির চিহ্ন দেখা গেল না। ধীরে ধীরে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে, মৃদু স্বরে সে বলল—এমন করে আপনাকে বিব্রত করা আমার উচিত হয় নি। আমাকে ক্ষমা করুন ডাক্তারবাবু—

গভীর মমতায় আমার চিত্ত আর্দ্র হয়ে উঠল। বললাম,—দেখুন,

বালির বাঁধ

আপনাদের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়; লোকের রোগ, শোক, বিপদের সঙ্গেই আমাদের কারবার, তবু আমি বলছি, আমাকে বন্ধু বলেই জানবেন, আমার কাছে কোন কথা বলতে কুণ্ঠিত হবেন না। আজ থেকে আপনার স্বামীর চিকিৎসার ভার আমি নিলাম—!

তরুণী তীক্ষ্নদৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চাইল, যেন আমার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখে নিল। তার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল,—চলুন, আপনাকে পথ দেখিয়ে দিই—

—পথ দেখাতে হবে না, আমি নিজেই যেতে পারব—

তরুণী সে কথায় কর্ণপাত না করে,—লণ্ঠন হাতে বাইরের বারান্দা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে এল। আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললাম,—আর নয়, এটুকু আমি অনায়াসেই যেতে পারব, আমার গাড়ী ওই দাঁড়িয়ে।

সে বারান্দা থেকে নামল না বটে, কিন্তু যতক্ষণ ফটক পার হয়ে আমি গাড়ীতে না উঠলাম, ততক্ষণ লণ্ঠন হাতে করে দাঁড়িয়েই রইল। সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে লণ্ঠণের ক্ষীণ আলোকে তাকে কোন রহস্তময় মূর্ত্তি বলে মনে হতে লাগল।

ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমার ডাকে ধড়মড় করে জেগে উঠে, ঈষৎ বিস্মিত ভাবে একবার আমার দিকে চাইল, তার পর বেগে গাড়ী চালিয়ে দিল।

*

*   *

রাত্রে আমার ভাল করে ঘুম হল না। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মেয়েটীর কথাই ভাবতে লাগলাম। জনমানবহীন একটা পোড়ো বাড়ীতে রুগ্ন স্বামীকে নিয়ে একলা এই মেয়েটী পাঁচ বৎসর মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আশ্চর্য্য এর মনের বল! কোন সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ে হয়ত এ বিপদে একেবারে মুষড়ে পড়ত। কিন্তু এর কি অসীম ধৈর্য্য, অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা! অশোভন লজ্জা বা কুণ্ঠা এর নাই। একজন অপরিচিত পুরুষকে দেখে অনাবশ্যক ভয়ে ও জড়সড় হয়ে পড়ে না।···

নারীর দেহে এত রূপও আমি কখনও দেখি নি। শীলাও রূপসী বটে, কিন্তু সে রূপের মধ্যে এমন প্রখরতা নেই, চিত্তে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করে না। শীলার রূপ যেন উষার প্রশান্ত মাধুর্য্য—আর এ যে মূর্ত্তিমতী বিদ্যুৎ শিখা। আহা, বড় দুঃখী এই মেয়েটী, বড়ই বিপন্ন!

সকালে উঠেই রোগীর জন্য ওষুধ তৈরী করতে বসে গেলাম। একবার ভাবলাম,—ড্রাইভারের হাত দিয়ে ওষুধটা পাঠিয়ে দিই। কিন্তু সে যদি ঠিক মত না দিতে পারে! না—নিজে যাওয়াই ভাল। এই তো দশ মিনিটের পথ, হেঁটেই যাওয়া যেতে পারে।···ডাক্তারের

পক্ষে রোগীর বাড়ীতে নিজে ওষুধ নিয়ে যাওয়া,—লোকের চোখে একটু বিসদৃশ মনে হতে পারে বটে! কিন্তু সব সময় আদব কায়দা কাঁটায় কাঁটায় মানা চলে না। একে মরণাপন্ন রোগী, তার উপর অসহায়া নারী, এখানে কোন আদব কায়দা, 'প্রেষ্টিজের' প্রশ্ন উঠতেই পারে না!

কোটটা গায়ে চড়িয়ে ওষুধের শিশি নিয়ে বের হবার উদ্যোগ করছি, এমন সময়—মিছির-জী প্রবেশ করে বলল,—এত সকালে কোথায় যাচ্ছ খোকাবাবু, চায়ের জল চড়িয়েছি যে—

আঃ, এই বুড়ো বামুনটার জ্বালায় আর পারা যায় না! ছেলেবেলা কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিল বলে, ও যেন আমার মাথা কিনে নিয়েছে!

একটু রুক্ষ স্বরেই বললাম,—বেলা তো কম হয় নি, মিছির-জী, আট্‌টা বাজে,—চায়ের জন্য বসে থাকলে আমার সব কাজ নষ্ট হবে!

মিছির-জী মৃদুস্বরে বলল,—রোজ এই আট্‌টার সময়েই চা খাও কি না—

—আজ জরুরী কাজ আছে, অপেক্ষা করতে পারব না—

—কিন্তু ফিরতে কত বেলা হবে, তার ঠিক কি—চা টা খেয়ে গেলেই ভাল হত—

নাঃ,—এই নাছোরবান্দা লোকটার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা! অগত্যা বললাম,—আচ্ছা নিয়ে এস শীগগীর, পাঁচ মিনিটের মধ্যে—

মিছির-জী দ্রুত পদে ভিতরে গেল এবং পাঁচমিনিটের মধ্যেই চা, ডিমসিদ্ধ প্রভৃতি নিয়ে হাজির হল। বিনা বাক্যব্যয়ে

সেগুলি গলাধঃকরণ করে বের হয়ে পড়লাম। তাড়াতাড়িতে দরজার একটা কাঁটায় লেগে, নূতন কাপড় খানার এক প্রান্ত যে ছিঁড়ে গেল, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করলাম না। একবার মনে হল, মিছির-জী যেন হতাশ করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ছে, কিন্তু পিছনে ফিরে চাইলাম না!

দিনের আলোয় বাড়ীটার কুৎসিত কদর্য্য মূর্ত্তি আরও ভাল করে চোখে পড়ল। একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই ভিতরে প্রবেশ করলাম। নীচে কোথাও জন মানবের চিহ্ন নাই। তরুণী হয়ত উপরে তার স্বামীর কাছে আছে, অনাহুত ভাবে সেখানে যাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু কেমন করেই বা তাকে খবর দিই! দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে ভিতরের বারান্দায় পাইচারী করতে লাগলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা এই ভাবে কেটে গেল, মন ক্রমেই অধীর চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল……

—ডাক্তার বাবু? কতক্ষণ এসেছেন!

চমকে পিছন ফিরে দেখলাম তরুণী দাঁড়িয়ে! কিন্তু একি মূর্ত্তি? তার কপালে একটা পটী বাঁধা, তাতে রক্তের দাগ,—শুষ্ক মলিন চেহারা, চুলগুলি এলোমেলো, চোখ দু'টা রক্তাভ। দেখলেই মনে হয়, সমস্ত রাত সে ঘুমায় নি।

বিস্ময়ে উদ্বেগে প্রশ্ন করলাম, একি কি!—হয়েছে আপনার?

সে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, ও কিছু নয়, অন্ধকারে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কপালটা একটু কেটে গেছে—

বেদনায় রাত্রে বোধ হয় ঘুমুতে পারেন নি? কোন ওষুধও দেন নি নিশ্চয়!

না, না, ওষুধের কোন দরকার নেই, ভারীতো একটু কেটে গেছে —!

—কিন্তু সেপ্‌টিক হয়ে যেতে পারে, অবহেলা করা ঠিক নয়—

তরুণী হেসে বলল,—ডাক্তারদের যত সব কাল্পনিক ভয়!

বলতে বলতে আমাকে সেই পূর্ব্ব পরিচিত অন্ধকার ঘরটাতে নিয়ে গিয়ে বলল—বসুন—

সেই ভাঙ্গা ইজি চেয়ারটাতে বসে পড়ে বললাম,—না, বসবার সময় নেই,—ওঁর সেই ওষুধটা—

তরুণীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

আপনি নিজে ওষুধটা নিয়ে এলেন কেন? কোন লোক দিয়ে পাঠালেই তো হত!

ঈষৎ কুন্ঠিতভাবে বললাম,—কোন লোক হাতের কাছে ছিল না, তা ছাড়া কোন লোকের হাতে দিতে সাহসও হল না।

তরুণী কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল, তার পর সহসা ব্যগ্র কণ্ঠে বলল,—ডাক্তার বাবু, আপনার ঋণ আমি কোন দিন শোধ করতে পারব না, গরীবের উপর অসীম আপনার দয়া—

মনে মনে আঘাত পেলাম, অন্তরের কোথায় যেন একটা বেদনা ঝিলিক দিয়ে উঠল। বললাম,—আপনাকে তো কালই বলেছি, দয়া করে আপনাকে অপমান করতে আমি চাই না, সে স্পর্দ্ধাও আমার নেই—

সে আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে নতমুখে কি যেন চিন্তা করতে লাগল। একটু পরে যখন সে মুখ তুলল, দেখলাম, একটা গভীর বেদনার রেখা তার মুখে ফুটে উঠেছে।

বালির বাঁধ

—ক্ষমা চাইছি ডাক্তার বাবু! সব সময় মনের ঠিক থাকে না, কি বলতে কি বলে ফেলি—

ধীরে ধীরে বললাম,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, যদি কিছু দোষ না নেন—

—বলুন—

আপনার স্বামীর বয়স তো বেশী নয়, কিন্তু এই বয়সে ওঁর শরীর এমন জরাজীর্ণ হয়ে পড়ল কেন?

তরুণী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল,—সে দুঃখের কাহিনী বলতে কান্না আসে ডাক্তার বাবু! যখন ওঁর স্বাস্থ্য ও শক্তি ছিল, তখন শরীরকে শরীর বলেই উনি গ্রাহ্য করেন নি। যত রকম উচ্ছৃঙ্খলতা মানুষের কল্পনায় আসতে পারে,—তার কিছুই করতে বাকি রাখেন নি। শ্বশুর ছিলেন অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক, নিজেও যেমন দুহাতে জলের মত খরচ করতেন, এক মাত্র পুত্রের খেয়ালেও তেমনি কোন দিন বাধা দেন নি। শেষে ওঁর খেয়ালগুলো এমন চরমে উঠেছিল—

বলতে বলতে তরুণী হঠাৎ থেমে গেল··· ·····

একটু পরে কি ভেবে পুনরায় বলল,—আমি এসে দেখলাম, এদের ঐশ্বর্য্যে যেমন ভাটার টান পড়েছে, ওঁর স্বাস্থ্যেও তেমনি ভাটা দেখা দিয়েছে! এত কাল যে সব ব্যাধি লুকিয়ে ছিল, তারা এখন ঘন ঘন হানা দিতে লাগল। এদিকে শ্বশুর স্বর্গে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলা-কমলাও বিদায় নিলেন। তার পর এই কয় বৎসর—

—রোগীর সেবাই করছেন?

সেই তো আমাদের কাজ, ডাক্তার বাবু! পতিব্রতা হিন্দুনারীর জন্য আপনারা তো ওই পথই নির্দ্দেশ করেছেন।

বলে সে এক অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে হাসল—যেন নির্ম্মেঘ আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠল।

আমার সমস্ত মন বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এই অসহায় তরুণীর উপর যে এমন নিদারুণ অত্যাচার হয়েছে, কে এর জন্য দায়ী? তার পিতা মাতা সমাজ?—আমরা সকলে?

সহসা কি ভেবে বললাম, আপনার কপালে ওই যে আঘাতের চিহ্ন, আমার সন্দেহ, ওটা পড়ে গিয়ে হয় নি! সত্যি করে বলুন তো কি হয়েছিল?

তরুণী কোন উত্তর দিল না, মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি আবার মিনতি করে বললাম,—আপনাকে বলতেই হবে,—নইলে আমি মনে শান্তি পাব না।

তরুণীর মুখে ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল,—শাণিত তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত।

—না শুনে আপনি ছাড়বেন না! তবে শুনুন,—ওটা আমার পাতিব্রত্যের পুরস্কার! এমন পুরস্কার লাভ আমার ভাগ্যে নূতন নয়, গা-সহা হয়ে গেছে!

—কিন্তু এ যে অসহ্য!

তার মুখে আবার সেই শাণিত তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত হাসি দেখা দিল, সে হাসি যেন আমার মর্ম্মস্থল ভেদ করল।

—বাঙ্গলা দেশের মেয়েদের সহিষ্ণুতার কোন সীমা আছে কি ডাক্তার বাবু?

—কিন্তু আপনি—

আমাকে 'আপনি' বলে লজ্জা দেবেন না,—আমার নাম প্রভা—

তারপর হঠাৎ সে ব্যস্ত হয়ে বলল,—এখন আমি যাই, ডাক্তার বাবু—ওঁকে ওষুধ দিতে হবে—

লঘু দ্রুতপদে সে চলে গেল, আমি বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

*

* *

বাড়ী ফিরে দেখলাম, টেবিলের উপর শীলার লেখা একখানা চিঠি পড়ে আছে। কয়দিন তাদের বাড়ীতে যাইনি বলে সে অনুযোগ করেছে এবং আজই বিকালে না গেলে সে যে খুব রাগ করবে, এ ভয়ও দেখিয়েছে। সত্যই তো, এ কয় দিন শীলার কথা আমার মনে পড়ে নি, রোগী নিয়ে এমনই ব্যস্ত! শীলা যদি এতে অভিমান করে থাকে, তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

শীলা আমার বাল্যসঙ্গিনী, পিতৃবন্ধুর কন্যা। ছেলেবেলায় আমার অধিকাংশ সময় ওদের বাড়ীতেই কাটত। দুজনে একসঙ্গে কত খেলা ধূলা, দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি করেছি, কত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কলহ বিবাদ মান অভিমানের পালা আমাদের মধ্যে হয়েছে। আমার মা তো শীলাকে দেখলে স্বর্গ হাতে পেতেন, তাকে আদর যত্ন করে তাঁর আর মন ভরত না। নিজের মেয়ে ছিল না বলেই বোধ করি শীলাকে দিয়ে তিনি সেই সাধ মিটাতে চাইতেন।

শীলার অত্যাচারে আমার কিন্তু এদিকে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হত। শীলা আসত যেন ঝড়ের মত,—আমার কাগজ পত্র খাতা উল্‌টিয়ে, জিনিষ পত্র ঘরময় ছড়িয়ে,—দেরাজ আলমারী ঘেঁটে, একটা লণ্ডভণ্ড

করে তুলত। আমি যতই বিরক্ত হয়ে চীৎকার করতাম, ততই সে যেন পেয়ে বসত,—তার কলকণ্ঠের হাস্যে ঘর মুখরিত হয়ে উঠত। অবশেষে আমি হার মেনে যখন গম্ভীর মুখে বসে থাকতাম, তখন শীলা এসে আমাকে তোযামোদ করত! মা মৃদু মৃদু হেসে বলতেন,—তুই ওর উপর রাগ করিস্ কেন বলত,—এমন লক্ষ্মী মেয়ে—

আমি ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দিতাম,—লক্ষ্মী তো ভারী, ঘরদোর অগোছাল, জিনিষ পত্র তছনছ করবার যম!

মা অবিচলিত কণ্ঠে বলতেন,—যাতে ও আরও ভাল ক'রে ওই কাজ গুলো করতে পারে, তার পাকা বন্দোবস্ত আমি করব!

—তা হলে আমাকে বাড়ী ছেড়েই পালাতে হবে—

বেশ ত তাই করিস্! তুই গিয়ে শীলাদের বাড়ী থাকিস্, শীলা আমার কাছে থাকবে। কেমন শীলা রাজী তো?

শীলা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে জবাব দিত,—আমি খুব রাজী, কাকীমা!

শীলার মা ইদানীং আর একটু স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করতেন। আমাদের নাম দিয়েছিলেন তিনি মাণিকজোড়। হাসতে হাসতে তিনি আমাকে বলতেন,—বিধাতা যে জোড় বেঁধে দিয়েছেন, আমাদের তা মেনে নিতেই হবে।

শীলার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠত। সে সেখান থেকে ছুটে পালাত। আমি মাথা নীচু করে মাটীর দিকে চেয়ে থাকতাম।

শীলার বাবা গম্ভীর ভাবে বলতেন,—বাঙ্গালী মাদের রক্ত মাংসের সঙ্গে ওই কথাটা মিশে আছে, স্বভাব যাবে কোথায়! আগে ওদের পড়াশুনা শেষ হোক, তারপর ও সব কথা ভাবা যাবে।

বালির বাঁধ

আমি কিন্তু বাল্যসখী ছাড়া শীলাকে অন্য কোনরূপে কল্পনাই করতে পারতাম না। সেই শীলা—যাকে এতটুকু বয়স থেকে দেখে আসছি,—তার সঙ্গে অন্য কোন সম্বন্ধের কথা চিন্তা করতেই আমার হাসি পেত। শীলার মনে কি ভাব হত, কে জানে!

তবু শীলার বাবার কথাটা আমার কানে যেন কেমন বেসুরো লাগত, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কোথায় যেন একটা আঘাত অনুভব করতাম।

সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তারপর জীবনের কত পরিবর্ত্তন হয়েছে। আজ শীলা আর বালিকা নয়,—তরুণী, বিদুষী!...

অপরাহ্নে শীলাদের বাড়ীতে গিয়ে প্রথমেই দেখা হল তার বাবার সঙ্গে। তিনি তাঁর লাইব্রেরী ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, – এই যে বিমান এসেছ, ব্যাপার কি বল দেখি? তোমাকে যে আজকাল আর দেখতে পাওয়াই যায় না!

আমি প্রণাম ক'রে বিনীতভাবে বললাম,—একটা কঠিন রোগী হাতে এসেছে, তাই নিয়েই এ কয়দিন ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে—

বিশ্বনাথ বাবু একটু হেসে বললেন,—বেশ বেশ! নূতন ডাক্তারের হাতে এমন দু'একটা 'কেস' পড়া ভাল। তোমার বাবা যখন প্রথম ডাক্তার হয়েছিল,—সে আজ তিরিশ বছর আগেকার কথা—তখন সে এক বছর ঠায় চুপ করে বসেছিল। তার প্রথম 'কেস' যোগাড় করে দেয় কে জান? আমি!

পাড়ার একটী ছেলের নিউমোনিয়া হল, পুরাণো ডাক্তারেরা সকলেই

বলল, ও বাঁচবে না। ছেলেটীর বাবা বড় গরীব, পয়সা দেবার সামর্থ্য ছিল না। সতীনাথকে বললাম, পয়সার জন্য ব্যস্ত হয়ো না, রোগীর সম্পূর্ণ ভার তুমি নাও, ওকে তোমার সারিয়ে তোলা চাই ই। সতীনাথ আমার কথা রাখল, ছেলেটী বেঁচে উঠল। সেই থেকে সতীনাথের নাম হয়ে গেল। তার পর এমন হয়েছিল যে, ও নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পেত না। কিন্তু ওর বিষয়-বুদ্ধি মোটেই ছিল না, যেমন রোজগার করত, তেমনি দুহাতে দান করত। না হলে, তোমার আজ ভাবনা কি বাবা!

পরলোকগত বন্ধুর কথা স্মরণ করে বিশ্বনাথ বাবু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন,—কিন্তু তোমার বাবার যতই 'কল' থাক, সন্ধ্যার পর একবার আমার এখানে আসত-ই। বলত; বৌদির হাতের চা না খেলে আমার সমস্ত দিনটাই ব্যর্থ হয়ে যায়! তোমার জ্যাঠাইমারও যতই কাজ থাক, সতীনাথের জন্য তিনি নিজের হাতে চা তৈরী করে দিতেন-ই!……সে সব দিনের কথা মনে করে আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না, বাবাজী! কোথায় আমি আগে যাব, তোমার বাবা আমাকে কাঁধে করবে, না,— নারায়ণ, নারায়ণ!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভেবে বললেন,—কিন্তু এবার আমার পালা, বাবাজী!

আমি নীরবে তাঁর কথা শুনছিলাম। এইবার বললাম,—আপনাকে আমরা শীগ্‌গীর ছেড়ে দিচ্ছিনে, জ্যাঠামশায়! আপনার বয়সই বা

এমন কি বেশী হয়েছে, এই বয়সে বিলাতের লোকেরা রীতিমত ঘোড়ায় চড়ে, সাঁতার কাটে, পার্লামেণ্টে গিয়ে বক্তৃতা করে।

জ্যাঠামশায় একটু হেসে বললেন,—বিলাত আর আমাদের দেশে ঢের তফাৎ বাবাজী! সেটা হল শীতের দেশ, আর আমাদের এদেশ ঠিক গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যে, গাছপালার মত মানুষও এখানে বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না, পঞ্চাশ পার হতে না হতেই বুড়ো হয়ে যায়। তাই ভাবছি, আমার সময় ত হয়ে এল, এখন যে কয়টা কর্ত্তব্য আছে, শেষ করে যেতে পারলে হয়!······ও কি, তুমি সেই থেকে ঠায় দাঁড়িয়েই আছ, ওই চেয়ারটাতে ভাল হয়ে বস।

বুঝলাম, একটা কোন বিশেষ কথা বলবার জন্যই এই আয়োজন। আমার বুক দুরু দুরু কাঁপতে লাগল।

বিশ্বনাথ বাবু এতক্ষণ তাকিয়া ঠেস দিয়ে আলবোলায় তামাক টানছিলেন, এইবার সোজা হয়ে বসে বললেন,—

দিন কাল যেমন পড়েছে, বাবাজী, শুধু এদেশের বিদ্যায় ডাক্তারদের আর তেমন নাম হয় না। আমি বলি কি, তুমি কিছুদিনের জন্য বিলাত ঘুরে এস, ওখানকার একটা ডিগ্রী পেলে, লোকে দশগুণ খাতির করবে।

তাঁর এই প্রস্তাবে আমি কেবল বিস্মিত নয়, একটু বিব্রত হয়েই উঠলাম। ধীরে ধীরে বললাম,—আপনি তো আমার অবস্থা জানেন, জ্যাঠামশায়,—বাড়ীখানা ছাড়া বাবা আর বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেন নি। বিলাত যাওয়ার খরচটা তো বড় কম নয়!

বিশ্বনাথ বাবু হেসে বললেন,—সব জানি। জেনেই বলছি, টাকার

জন্য আটকাবে না। শীলা আমার একমাত্র মেয়ে, ওর নামে ত্রিশ হাজার টাকা আলাদা করে রেখেছি—

আমার বিস্ময় চরমে উঠল। জ্যাঠামশায় তাহলে সমস্ত প্ল্যান তৈরী করে রেখেছেন, আমার মতামত নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করেন নি। মনে একটু অভিমান হল।

বিশ্বনাথ বাবুর কিন্তু সে সব কথা ভাববার অবসরই ছিল না। আমার দিকে চেয়ে সস্মিত মুখে বললেন, তাহলে বিয়েটা এই বোশেখ কি আষাঢ়েই হয়ে যাক, কি বল,—তারপর বিলাত যেও।

অভিমান ক্রমেই জমাট বেঁধে উঠছিল। মানুষের স্বভাবই এই, তার ইচ্ছার উপর কেউ যদি প্রভুত্ব করতে চেষ্টা করে, তবে সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

আমি বললাম,—মা কাশীতে আছেন, তাঁর মত না নিয়ে তো কিছু হতে পারে না।

বিশ্বনাথ বাবু গম্ভীর ভাবে বললেন,—তোমার মার কোন অমত হবে না, ওঁরা দুজনে মিলে আগে থেকেই এটা ঠিক করে রেখেছেন। আমি কালই তাঁকে চিঠি লিখে দিয়েছি, এই সপ্তাহে কলকাতায় ফিরতে

বলে বিশ্বনাথ বাবু পুনরায় খবরের কাগজে মন নিবিষ্ট করলেন, যেন কথাটার তিনি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে ফেলেছেন, আমার আর কিছু বলবার নাই!

আর বৃথা কথা না বাড়িয়ে আমি শীলার সন্ধানে অন্দরের দিকে গেলাম। মনে হল, কে একজন যেন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল, আমি যেতেই চক্ষের নিমিষে অন্তর্হিত হল। শুধু মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ ঝলকের মত একখানা শাড়ীর প্রান্ত, এলায়িত বেণীর রেখা আমার দৃষ্টিপথে পড়ল। কে এমন ভাবে আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিল! শীলা? আমারই চোখের ভুল হয়নি তো?

শীলার ঘরে গিয়ে দেখলাম, সে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে, কি একখানা বই অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে পড়ছে।

আমি কিছুক্ষণ দ্বার প্রান্তে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু শীলার ধ্যানভঙ্গ হল না। অবশেষে ধীরে ধীরে ডাকলাম—শীলা!

শীলা চমকে পিছনে ফিরল, এবং আমাকে দেখে যেন বিস্মিত ভাবে বলল,—বিমান-দা! কি ভাগ্যি! তুমি যে আজ হঠাৎ এ বাড়ীতে আসবে, আমি তা কল্পনাই করতে পারিনি!

বললাম,—হঠাৎ যে আসিনি, তাতো তুমি জানই। তোমার হুকুম পেয়েও গড় হাজির হব, এত বড় দুঃসাহস আমার নেই—

শীলা গালে হাত দিয়ে বলল,—আমার উপর এতটা ভক্তি হল কবে? চিরকাল তো আমার উপরেই হুকুম চালিয়ে এসেছ। আজ আবার তার উলটো ব্যবস্থা কেন!

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, old order changes yeilding place to new—

শীলা খিল খিল করে হেসে উঠে বলল,—আজকাল ডাক্তারীর সঙ্গে সঙ্গে কাব্যচর্চ্চাও করছ নাকি? কিন্তু ডাক্তারের মুখে

বালির বাঁধ

কবিত্ব বড়ই মারাত্মক বিমান-দা—বেচারা রোগীর প্রাণ নিয়ে টানাটানি—

—কেন ডাক্তারীর সঙ্গে কবিত্বের বিরোধ আছে নাকি! আমি তো দেখি, চিকিৎসাশাস্ত্রে যেমন গভীর কবিত্ব এমন আর কিছুতে নেই। আমাদের আর্য্য ঋষিরা একথা ঠিক বুঝেছিলেন, তাই তাঁরা চিকিৎসকের নাম দিয়েছিলেন, কবিরাজ। আদিকবি বাল্মীকি যে ভাল একজন চিকিৎসকও ছিলেন, তার প্রমাণ রামায়ণেই আছে। বিশল্যকরণী এমন অব্যর্থ মহৌষধ যে লক্ষ্মণ ঠাকুর মরে বেঁচে উঠলেন—

—থাক, তোমার আর বাজে বকতে হবে না। ভেবেছিলাম, ডাক্তার হয়ে একটু গম্ভীরপ্রকৃতি হবে,—কিন্তু এখনও তোমার সেই ছেলেমানুষী ভাব যায় নি—

আমি শীলার মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। তাকে তো ছেলেবেলা থেকেই দেখছি, কিন্তু আজ যেন নূতন করে তার মূর্ত্তি আমার চোখে পড়ল। বসন্তাগমে নবীন আম্রপল্লব যে অপূর্ব্ব সুষমায় বিকশিত হয়ে উঠে, শীলার সর্ব্বাঙ্গে আজ সেই সুষমা। পেলব দুই বাহুতে, ঈষৎ উন্নত বক্ষে, লাবণ্যের তরঙ্গ লীলায়িত; পূরন্ত কপোলে, নির্ম্মল ললাটে অরুণোদয়ের রক্তিমা; অধরে মৃদু হাস্যের রেখা স্থির বিদ্যুতের মত,—দুই চোখে কি যেন স্বপ্নের আবেশ। শীলার এই অপরূপ সৌন্দর্য্য আমি এই প্রথম আবিষ্কার করে, মুগ্ধনেত্রে তার দিকে চেয়ে রইলাম। আমার সে দৃষ্টিতে কি ছিল জানি না, কিন্তু এই প্রথম আমার দৃষ্টির সম্মুখে সে চক্ষু নত করল, তার মুখে ঈষৎ রক্তের উচ্ছ্বাস ফুটে উঠল।...

বালির বাঁধ

আমি কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললাম,—কেন ডেকেছিলে বলতো ?

শীলা মুখ গম্ভীর করে বলল,—না ডাকলে বুঝি আসতে নেই ! এমনই কি কাজ, যে, একটী বারও তোমার এদিকে আসবার সময় হয় না !

বললাম,—নূতন ডাক্তার, চার ফেলে বসে আছি। কিন্তু রুই কাতলা দূরে থাক, চুণা পুঁটিও গাঁথতে পারছি নে। একটা মুমূর্ষু রোগী যদিও বা জুটেছে, তার ফি পাওয়া দূরে থাক, ওষুধের দাম পর্য্যন্ত নিজেকে দিতে হচ্ছে।

শীলা উচ্চহাস্য করে বলল,—বড়ই আপশোষের কথা ! কিন্তু তার প্রতিশোধ কি তুমি আমার উপর দিয়ে নিতে চাও ?

গম্ভীর ভাবে বললাম,—ভাবছি, কলকাতা ছেড়ে, পশ্চিমের কোন এক অখ্যাত অজ্ঞাত জায়গায় গিয়ে বসব। কলকাতার অলিগলিতে এত ডাক্তার যে, রোগীর চেয়ে ডাক্তারের সংখ্যাই বোধ হয় বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার এই সহর ত্যাগের সঙ্কল্পে শীলার মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। অতি সহজ ভাবেই সে বলল,—সে যখন যাবে যেও, আপাততঃ আমি যে নূতন গানটা শিখেছি, চুপকরে বসে শোনো।

শীলার গানের প্রধান সমজদার ছিলাম আমি. নূতন কোন গান শিখলেই আমাকে না শুনিয়ে সে তৃপ্ত হত না। অথচ সঙ্গীতশাস্ত্রে আমি একেবারে আনাড়ী ছিলাম বললেও অত্যুক্তি হয় না !

আমি হেসে বললাম,—ও, এই গান শোনাবার জন্যই বুঝি আমাকে জোর তলব !

বালির বাঁধ

শীলা কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল,—ক্ষতি কি, শ্রোতা তো চাই!—বলে সেতারটা সে তুলে নিল।

নব বসন্তের আবাহন গীতি। শীলার গান অনেক শুনেছি, কিন্তু আজ তার কণ্ঠে যে সুরের ঝঙ্কার, ভাবের আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, এমন আর কোন দিন অনুভব করিনি। সে যেন আজ গানের ভিতর দিয়ে প্রাণের কি এক অব্যক্ত বেদনা প্রকাশ করতে চাইছে। আমার সমস্ত মন তার সেই আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বরে, প্রকাশের অব্যক্ত বেদনায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ক্ষণকালের জন্য যেন বাস্তবকে ভুলে গেলাম,—মনে হল, তার সৃষ্ট সেই সুরলোকে শুধু সে আর আমি! বসন্তের আকাশে বাতাসে, বন মর্ম্মরে, নদীর কলধ্বনিতে যে সঙ্গীত নিত্য মুখরিত হয়ে উঠছে, এ যেন তারই প্রতিধ্বনি!

শীলার কলকণ্ঠের হাস্য, সঙ্গে সঙ্গে তার সাগ্রহ প্রশ্নে আমার স্বপ্ন ভাঙ্গল।

—কেমন লাগল বিমান-দা?

তাড়াতাড়ি বললাম,—এমনই ভাল লাগল যে, শীগ্‌গির শেষ হয়ে গেল বলে আপশোষ হচ্ছে—

শীলা ভ্রূভঙ্গি করে বলল,—অত খোসামোদ আর করতে হবে না,—সুরটা ঠিক হয়েছে কিনা বল।

—সুরের আমি কি জানি! সে ওজন করবে—ওস্তাদ কালোয়াতেরা তালমাত্রার দাঁড়ি বাটখারা নিয়ে! আমি শুধু তোমার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য উপভোগ করেই তৃপ্ত—

শীলা মৃদু হেসে বলল,—আবার সেই কবিত্ব! তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না—

একটু চুপ করে থেকে সলজ্জভাবে বলল,—বিদেশে যখন যাবে, তখন সেখানকার অপ্সরীকিন্নরীদের গান শুনে, এ গানের কথা কি আর মনে থাকবে!

আমি বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে বললাম,—বিদেশে যাব, কে তোমাকে বলল!

শীলা দুষ্টামীর হাসি হেসে বলল,—কেউ বলে নি, স্বপ্নে দেখেছি।

মনের প্রচ্ছন্ন অভিমানটা আবার জেগে উঠল। বললাম,—জ্যাঠামশায়ও ওই রকম একটা কথা বলছিলেন বটে। দেখলাম কথাটা তোমরা সকলেই জান, কেবল আমিই জানি নে—

আমার কথার মধ্যে যে একটু ঝাঁঝ ছিল, তা শীলার কান এড়াল না। ম্লান হেসে সে বলল—

—আমি জানতাম, বিলাত যাওয়া তোমার চিরকালের একটা সাধ, ছেলেবেলায় আমরা দুজনে বসে প্ল্যান করতাম,—বিলাত, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, আমেরিকা কত দেশ দেখবে, কত নূতন জিনিষ শিখবে, এই ছিল তোমার সঙ্কল্প।—সে সব কথা ভুলে গেছ?

—ভুলিনি,—কিন্তু জানইতো, বিলাত যাবার সঙ্গতি আমার নেই, আর পরের পয়সাতেও আমি বিলাত যেতে চাইনে—

শীলার মুখে গভীর বেদনার ছায়া পড়ল। কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে সে ধীরে ধীরে বলল,—আমরা বুঝি তোমার পর?

সেই বেদনাভরা কণ্ঠস্বর আমার বুকে যেন শেলের মত বিদ্ধ হল। ব্যগ্রভাবে বললাম,—না, না,—পর হতে যাবে কেন, তোমাদের চেয়ে আপনার আর আমার কে আছে? কিন্তু দেখ, পুরুষের শক্তিই তার

একমাত্র সম্বল। অন্যের কাছে ঋণ করলে, তার পৌরুষের অপমান হয়—

শীলার মুখ কালো হয়ে গেল। বেদনার হাসি হেসে সে বলল,—আর ঋণ করবার ভারটা বুঝি কেবল নারীর উপর, অপমান তার কিছুতেই হয় না!

কথাটা যে এতদূর গড়াবে তা ভাবিনি। নিজের দুর্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিজের উপর ধিক্কার হল।

অনুতপ্ত কণ্ঠে বললাম,—আমাকে ভুল বুঝ না, শীলা! ঠিক যে কথাটা বলতে চাই, সে হয়ত বুঝিয়ে বলতে পারিনি—

শীলার মুখের অন্ধকার কাটল না। গম্ভীর ভাবে বলল,—আমি বেশ বুঝতে পারছি!

কি উত্তর দেব ভাবছি, এমন সময় একজন ঝি এসে বলল,—সেই নাগ সাহেব এসেছেন দিদিমণি, কর্ত্তা বাবু আপনাকে খবর দিতে বললেন।

আমি ঈষৎ বিস্মিত ভাবে শীলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, নাগ সাহেব আবার কে?

শীলা মৃদু হেসে বলল,—মার দূর সম্পর্কের এক বোনের ছেলে, নূতন ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছেন। তার উপর আবার বড়লোক, তাই অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না।

শীলা কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে গেল, মনে হল কি একটা কথা সে চাপা দিতে চায়। বললাম,—ব্যারিষ্টার সাহেব প্রায়ই বোধ হয় এদিকে আসছেন—

—হ্যাঁ, প্রায়ই আসেন, বাবার সঙ্গে গল্পসল্প করেন, বাবাও যেমন, গল্পের গন্ধ পেলেই মেতে ওঠেন—

মৃদু হেসে বললাম,—কিন্তু আমার মনে হয়, পিতার চেয়ে কন্যার সঙ্গে ভাব জমাবার ইচ্ছাটাই তার বেশী !—

শীলা গম্ভীর ভাবে বলল,—তা হ'তে পারে। কিন্তু আমি ওকে মোটেই আমল দিই না, ওর ওই সব লম্বাচৌড়া কথা আমার ভাল লাগে না,—যেন দিন কয়েক বিলাতে থেকে কি একটা রাজ্য জয়ই করে এসেছে ! চালচলন, আদব কায়দা সবই কৃত্রিম, ঠিক যেন মুখোস পরা !

—তাহলে দেখছি, বিলাতফেরতদের উপর তোমার মোটেই শ্রদ্ধা নেই, অথচ আমাকে বিলাত পাঠাবার জন্য তুমি ব্যস্ত !

এতক্ষণে শীলা সহজ ভাবে হেসে বলল,—তার অর্থ, যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ,—এই প্রবাদটা আমি মোটেই মানি না—

জ্যাঠাইমা ঘরে এসে বললেন,—আমি ভাবছি, বিমান বুঝি আমার সঙ্গে দেখা না করেই পালাল—

প্রণাম করে বললাম,—তাকি পালাতে পারি, জ্যাঠাইমা, তোমার বিশ্বাস হয় ?

জ্যাঠাইমা হেসে বললেন,—না বাবা, বিশ্বাস হয় না ! এখন চল দেখি, খাবারগুলো সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল—

—এই যাই—

জ্যাঠাইমা পিছন ফিরতেই শীলাকে চুপি চুপি বললাম,—তুমি তো এখন সেই নাগ সাহেবকে অভ্যার্থনা করতে যাবে !

শীলা ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল,—আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ওর সঙ্গে বসে বাজে বকি ! বাবাই অভ্যর্থনা করবেন। তুমি এস, দেরী করলে মা রাগ করবেন।

* * *

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শীলা ও নূতন ব্যারিষ্টার নাগ সাহেবের কথাই ভাবতে লাগলাম। লোকটীকে আমি দেখিনি. তবু তার উপর আমার কেমন একটা রাগ হল, যেন আমার কোন সম্পত্তি সে কেড়ে নিতে এসেছে,—সাত রাজার ধন মণিতে ভাগ বসাতে চাইছে। মনে মনে হাসি পেল। শীলার সঙ্গে যদি তার ঘনিষ্ঠতা হয়-ই, তাতে আমার কি? শীলা ধনী জমিদারের মেয়ে, রূপসী, বিদুষী, সে কি আমার কাছে এমন কোন সর্ত্তবদ্ধ হয়েছে যে, আর কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা করবে না? তা ছাড়া, নাগ বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার, বড়লোক, আমার চেয়ে ঢের যোগ্য ব্যক্তি। আমি সামান্য একজন ডাক্তার, পসার নাই, কে আমাকে খাতির করবে? জগতের নিয়মই এই,—যেখানে অর্থ, পদ মর্য্যাদা, নামডাক—সেই দিকেই লোকের আকর্ষণ,—মধ্যাকর্ষণের মতই তার টান অব্যর্থ!

কেমন একটা নিস্পৃহ বৈরাগ্যের ভাব এল। মনে হল জগতে আমার কোন কাম্য নেই, আমি কিছুই চাইনে,—অর্থ, মান মর্য্যাদা, নামযশ সবই তুচ্ছ! ডাক্তারী করে যদি কিছু পরের সেবায় লাগতে

পারি, তাহলেই আমার জীবন সার্থক। শীলার সঙ্গে সম্বন্ধ, বিলাত যাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সবই যেন মিথ্যা মায়া মনে হতে লাগল।

কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্য নয়, শীঘ্রই সেই বৈরাগ্যের শিথিল স্তর ভেদ করে দেখা দিল ঈর্ষা ও অভিমান,—নাগের উপর—সঙ্গে সঙ্গে শীলার উপর! শীলা বোধ করি সব কথা আমাকে বলেনি, ভিতরে ভিতরে নাগের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হয়ে উঠছে। জ্যাঠামশায় সে সব কথা কিছুই জানেন না!......দূর ছাই, এসব বাজে কথা ভেবে আমি মাথা খারাপ করি কেন?......

সকালে ঘুম ভাঙ্গতে দেরী হল। প্রথমেই মনে পড়ল প্রভা আর তার স্বামীর কথা। তাইতো কাল তাদের কোন খবর নেওয়া হয়নি। একটা কঠিন রোগীর ভার যখন নিজের ঘাড়ে নিয়েছি, তখন ডাক্তার হিসাবেও তো একটা কর্ত্তব্য আছে! প্রভা অসহায়া নারী, আমাকে যে খবর দেবে, এমন উপায়ও তার নেই। নিজের এই গাফিলতীতে মনে বড় অনুশোচনা হল।

সন্ধ্যার একটু আগে গায়ে একটা কোট চড়িয়ে বের হয়ে পড়লাম। মিছির-জীকে বললাম,—আসতে যদি বেশী রাত হয়, আমার জন্য বসে থেকো না, খেয়ে নিও, আমি একটা জরুরী কাজে যাচ্ছি।

মিছির-জী অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার চেয়ে নিজের কাজে মন দিল।

ওদের বাড়ীতে ঢুকেই দেখি, প্রভা কলতলায় একরাশ কাপড় নিয়ে বসেছে। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল এবং কতকটা বিস্মিত ভাবেই চেয়ে রইল।

প্রভা ধীরে ধীরে বলল,—আমিতো আপনাকে আসতে বলিনি—

আমার বিস্ময়ের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেল। একি সেই প্রভা—হঠাৎ দুদিনের মধ্যে একি পরিবর্ত্তন ?

সসঙ্কোচে বললাম,—কিন্তু রোগীর ভার যখন নিয়েছি, তখন আমার কর্ত্তব্য—

প্রভা ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল,—না ডাকলেও জোর করে রোগার বাড়ী আসতে হবে, এমন তো শুনিনি !—

আমি হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম,—বেশ, এর পর না ডাকলে আসব না, কিন্তু আজ যখন এসেছি, তখন রোগীকে একবার না দেখে যেতে পারিনে—

প্রভা রাগে দুঃখে প্রায় কেঁদে ফেলল, রুদ্ধস্বরে বলল,—আমি অসহায়া নারী বলেই আমাকে এভাবে অপমান করতে সাহস পাচ্ছেন।

প্রভার এই ভাব দেখে আমি ক্ষণকাল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর দ্রুতপদে বাইরের দিকে অগ্রসর হলাম। ক্ষোভে, ঘৃণায়, লজ্জায় আমার নিজের উপর একটা ধিক্কার আসছিল।

দরজার কাছে গিয়ে ঈষৎ ফিরে দাঁড়াতেই দেখি, প্রভা আমার দিকে ছুটে আসছে। কাছে এসে দুহাত জোড় করে ব্যাকুলকণ্ঠে সে বলল,—ডাক্তার বাবু একটু দাঁড়ান, যাবেন না, আপনাকে যে অপমান করেছি, তার কঠিন শাস্তি আমাকে দিয়ে যান—

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম,—সেই সুন্দর মুখে লজ্জা দুঃখ বেদনার রেখা ফুটে উঠেছিল, মনে হল, তার সৌন্দর্য্য

যেন শতগুণে বেড়ে গিয়েছে। বড় বড় চোখ দুটী অশ্রুপূর্ণ, নাসিকা স্ফুরিত, পাতলা ঠোঁট ঈষৎ কাঁপছে।

ধীরে ধীরে বললাম,—আমি তো বর্ব্বর পশু নই, প্রভা, যে তোমাকে শাস্তি দিয়ে প্রতিশোধ নেব—

—কিন্তু আমার কৃতঘ্নতার বোঝা যে কেবলই ভারী হয়ে উঠছে, ডাক্তারবাবু!

—তোমার কোন অপরাধ আমি গ্রহণ করিনি, করবার সাধ্য আমার নেই। তুমি বিশ্বাস কর প্রভা, তোমার মঙ্গলই আমার একমাত্র কাম্য। এখন চলি—

প্রভা অধীর স্বরে বলল,—না, না, সে হতে পারে না! আপনি ওঁকে একবার দেখে যান, নইলে আমার মন কিছুতেই শান্ত হবে না—

—বেশ চল—

রোগীর ঘরে গিয়েই আমি চমকে উঠলাম। এ যে জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। অর্দ্ধ অচেতন অবস্থা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অসাড়তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যার সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে তার ভারী নিঃশ্বাসপতনের শব্দ কেবল জানিয়ে দিচ্ছে যে, প্রদীপের শিখা এখনও নেবেনি, কিন্তু প্রবল বাতাসের বেগ আর বেশীক্ষণ সহ্য করবার ক্ষমতাও তার নেই।

প্রভা আমার মুখের দিকে উদ্বিগ্ন ভাবে চেয়ে নিম্নস্বরে বলল,—কালকার চেয়ে আজ একটু ভাল মনে হচ্ছে,—শান্ত হয়ে শুয়ে আছেন, বোধকরি আপনার ওষুধের গুণেই হয়েছে।

আমি ম্লান হেসে বললাম,—তা ঠিক বলা যায় না, বরং আজকার রাতটায়ই খুব বেশী সাবধান হতে হবে—

মুহূর্তে প্রভার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, কিছুক্ষণ প্রস্তর মূর্তির মত নিস্তব্ধ ভাবে সে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের জলের মত কেঁদে ফেলে বলল—তাহলে কি হবে ডাক্তারবাবু?

তাকে সান্ত্বনা বা সাহস দেবার ভাষা নেই—কিন্তু ডাক্তারকে নির্ম্মম কঠিন হতে হবে! বললাম,—অত ব্যাকুল হয়ো না প্রভা, আমি জানি, তোমার অসাধারণ মনের বল, আর সে বলের পরিচয় দেবার এই সময়! তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই একটা ওষুধ নিয়ে আসছি।—

বড় রাস্তার মোড়ের ডিস্পেন্সারী থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওষুধটা নিয়ে এলাম এবং রোগীর দেহে প্রয়োগ করলাম। জানতাম এ শুধু পড়ো' দেয়ালকে বাঁশ বেঁধে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা। কিন্তু এমন সময় আসে, যখন ফলাফল বিচার করবার অধিকার চিকিৎসকেরও থাকে না।

ঘরের কোণে একটা ধূলামাখা চেয়ার পড়েছিল, সেইটাই টেনে নিয়ে বসলাম। প্রভা একবার উদাসভাবে আমার দিকে চেয়ে দেখল মাত্র, কোন কথা বলল না। সে রোগীর শিয়রে নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মতই বসে রইল।

*

*　　*

গভীর রাত্রি, গাঢ় অন্ধকার সমস্ত বাড়ীটা গ্রাস করে ফেলেছে। রোগীর ঘরের ক্ষীণ দীপশিখা চারদিকের অন্ধকারকে যেন আরও ভীষণতর করে তুলেছে। সেই অন্ধকারের রাজ্য ভেদ করে বাইরের পৃথিবী থেকে প্রাণের কোন সাড়াই আসতে পারছে না। অসহ্য নিস্তব্ধতার মধ্যে কালের সীমারেখা যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কেবল থেকে থেকে রোগীর ভারী নিঃশ্বাস পতনের শব্দ মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের শেষ সংগ্রামের পরিচয় দিচ্ছে।

ওঃ, সে কি নিষ্ঠুর সংগ্রাম! যেন বাঘের কবলে পতিত ভীত ত্রস্ত কম্পিতকলেবর হরিণীর আত্মরক্ষার ব্যাকুল চেষ্টা,—অসীম কাতরতা! কিন্তু সাধ্য কি তার! প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, প্রতি পল মৃত্যু যে তাকে নির্ম্মমভাবে অনুসরণ করে এসেছে, একবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি, তার শ্যেন চক্ষুর তীক্ষ্ণ শীতল ক্রূর দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্যও শিথিল হয় নি। আজ অরণ্যানীর শেষ প্রান্তে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ক্ষতবিক্ষতদেহ জীবন—পলায়নের সাধ্য তার নাই, আততায়ীর করাল গ্রাসে ধরা দিতেই তাকে হবে।...

সেই মুহূর্ত্তে মনে হল, জীবন কত তুচ্ছ, কত ক্ষুদ্র, কত অসহায়! সমস্ত বিশ্ব চরাচর ব্যাপ্ত করে বিরাট মৃত্যুরই রাজত্ব। অসীম অনন্ত তার বিস্তার, অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড তার প্রতাপ! জীবন বুঝি একদিন ভুল করে এই শত্রুর রাজ্যে পদার্পণ করেছিল—অতি ভয়ে ভয়ে, অতি সংগোপনে! কিন্তু মৃত্যুর দূত আজ তাকে ধরে ফেলে রাজ দরবারে আহ্বান করেছে—কঠিন নির্ম্মম তার বিচার—নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় নেই!

শুনতে পাই, কোন সুদূর অতীতে একজন কেবল অসাধ্য সাধন করেছিল মৃত্যুর গ্রাস থেকে জীবনকে ফিরিয়ে এনেছিল। সে একটী মেয়ে। তার কঠিন তপস্যায়, ভীষণ সঙ্কল্পে—অপরাজেয় মৃত্যুও পরাস্ত হয়ে ছিল! সাবিত্রীর সেই অমরকাহিনী কাব্যে, পুরাণে, ব্রত কথায়, লোকগাথায় চিরদিন কীর্ত্তিত!

সম্মুখে প্রভার ধ্যানমগ্ন নিশ্চল মূর্ত্তি দেখে মনে হতে লাগল, এও তো তাদেরই জাত, কঠিন তপস্যায় এও বুঝি মৃত্যুকে পরাস্ত করতে চায়। কিন্তু এযে ঘোর কলিযুগ, সতীর তেজ, অদম্য ইচ্ছাশক্তিও এযুগে মৃত্যুকে নিবারণ করতে পারে না।

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহরে সহসা রোগীর যন্ত্রণা বেড়ে উঠল, সে অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল। তার লক্ষ্যহীন ব্যাকুল দৃষ্টি দেখে মনে হল যেন সে শেষযাত্রার পূর্ব্বে একবার পিছনের দিকে চেয়ে দেখছে। প্রভার মুখ পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম,—

—ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, আর একটু—

বালির বাঁধ

প্রভা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার চাইল,—বুঝলাম, নিজের মনকে সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে নিয়েছে !

রোগীর শয্যার একদিকে প্রভা, আর একদিকে আমি - চরমবিপদের প্রতীক্ষায় দুজনে নিস্তব্ধভাবে বসে রইলাম। রাত্রি যেন অত্যন্ত মন্থর গতিতে একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে প্রভাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এ কালরাত্রির বুঝি আর শেষ নাই ! কিন্তু অবশেষে অন্ধকারের গাঢ়তা ক্রমে হ্রাস হয়ে আসতে লাগল, লোকালয়ে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি জেগে উঠল। আলোকের দূত দূর আকাশের প্রান্ত থেকে ধীরে—অতি ধীরে ধরণীতে নেমে এল। সূর্য্যের প্রথম রশ্মি জানলার ছিদ্র দিয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করল।

রোগীর দিকে চেয়ে দেখলাম, তার মুখভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ! যে প্রবল বন্যার বেগ বাঁধ ভাঙ্গবার উপক্রম করছিল, সে বুঝি সহসা থমকে দাঁড়িয়েছে, ঘড়ির কাঁটা শেষ প্রান্তের কাছাকাছি এসে আবার ঘুরে গেছে।……চরম সঙ্কটের মুহূর্ত্ত অতিক্রান্ত হয়েছে।

মৃত্যুর দূত আজকার মত বোধকরি শূন্য হাতেই ফিরে গেল !

*

* *

বাড়ী ফিরে দেখলাম মা কাশী থেকে এসেছেন এবং আমারই প্রতীক্ষা করছেন।

আমার মুখের দিকে চেয়েই বললেন,—একি চেহারা হয়েছে তোর! মুখ চোখ কালি হয়ে গেছে, চুলগুলো উস্কখুস্ক—কোথায় গিয়েছিলি?

মায়ের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠলো।

পদধূলি নিয়ে বললাম,—একটা কঠিন রোগী নিয়ে সমস্ত রাত কাটাতে হয়েছে কিনা—

—তবে শীগ্‌গির স্নান করে নে,—অন্য কথা পরে হবে।

—এই যাই। কিন্তু তুমি আসবে বলে তো কোন খবরই দাওনি মা!

—তোমার ও-বাড়ীর জ্যাঠামশায় লিখলেন, চিঠি পেয়েই যেন চলে আসি, ভারী জরুরী কাজ—

জ্যাঠামশায় বলেছিলেন বটে, মাকে চিঠি লিখবেন। কিন্তু এমন জোর তাগিদ দিয়ে বুড়ো মানুষকে তীর্থ থেকে টেনে আনবার

কি দরকার ছিল? মনে মনে একটু বিরক্ত হলাম, কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ না করে সহজ সুরেই বললাম,—

—তোমার শরীর ভাল আছে তো মা, গাড়ীতে কোন কষ্ট হয় নি?

—আর বাবা, এখন আর আমার শরীরের ভাল মন্দ! বিশ্বেশ্বরের কৃপায় হাড় ক'খানা গঙ্গায় পড়লেই বাঁচি। কিন্তু যাবার আগে তোর একটা স্থিতি করে না গেলে পরলোকেও যে শান্তি পাব না।

—মার যেমন কথা, আমি কি অজলে অস্থলে ভেসে বেড়াচ্ছি না কি?

—ঘর দোরের চেহারা দেখেই তা বেশ বুঝতে পারছি। জিনিষ পত্র এলোমেলো, ঘরময় বই কাগজ ছড়ান, কত কালের জঞ্জাল জমে উঠেছে। এখানে যে মানুষ বাস করে, দেখে তা মনে হয় না। তুই যে এর মধ্যে কি করে থাকিস, তা আমি ভেবে পাচ্ছি না। মিছিরের কাছে শুনলাম তোর খাওয়া দাওয়ারও ঠিক নেই, ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াস, রাতেও সব দিন বাড়ী থাকিস নে—

মনে মনে মিছিরের মুণ্ডপাত করে বললাম,—এর মধ্যেই মিছির তোমার কাছে দশখানা করে লাগিয়েছে। ও মনে করে, এখনও আমি সেই—"খোকাবাবুই" আছি, আমাকে শাসন করবার ভার ওর উপর তুমি দিয়ে গিয়েছ।—ওকে পেন্স্‌ন না দিলে আর চলছে না—

—আহা, বুড়ো বামুন তোকে ভালবাসে, কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে—

হেসে ফেলে বললাম,—সেই তো মুস্কিল হয়েছে মা—

মাও হাসলেন।

বালির বাঁধ

শরীর মন দুই-ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, শরীরের চেয়ে মনের ক্লান্তিই বেশী। মৃত্যুকে পলে পলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করবার মত এত বড় ক্লান্তি আর বোধহয় কিছুতেই হয় না! কোন রকমে স্নানাহার সেরে শুয়ে পড়লাম।

অপরাহ্ণে ঘুম তখনো ভাল করে ভাঙ্গে নি, বিছানা ছেড়ে উঠব মনে করছি—অথচ ওঠবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারছি না।

ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের স্বর কানে ভেসে আসছিল। বোধ হয় পাশের বাড়ীর মেয়েরা মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে আর একবার চোখ বুজে নিদ্রার সাধনা করবার চেষ্টা করলাম।······

কিন্তু এযে শীলার কণ্ঠস্বর বলে মনে হচ্ছে! সেই কোমল মিষ্ট স্বর—দূরাগত বংশী ধ্বনির মত,—সেই তরল হাসি সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত বাতাসে তরঙ্গ তুলছে। ও স্বর তো আমার ভুল হবার কথা নয়! শীলাই এসেছে, মা নিশ্চয়ই তাকে ডেকে এনেছেন।

নিদ্রার আশা ত্যাগ করে উঠে পড়লাম। ভিতরের বারান্দায় গিয়ে দেখি, শীলা মার কাছে বসে আছে। তার বিপুল কেশজাল সমস্ত পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে, মা চিরুণী দিয়ে সেই কেশের সংস্কার করছেন। একখানা কালো রঙের সাড়ী তার পরণে, তার গৌরবর্ণ তাতে আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে।······

মা বললেন,—তোর ঘুম ভাঙ্গল, শীলা কতক্ষণ থেকে এসে বসে আছে।

—শীলা যে এসেছে, তা কি করে জানব বল।

বালির বাঁধ

শীলা হাসতে হাসতে বলল,—আমি তোমার দরজার কড়া ধরে তিন-চারবার নেড়েছি, ভিতরে উকি দিয়েও দেখেছি। কিন্তু এমন ঘুম তোমার—

—হ্যাঁ, ঘুমটা একটু বেশী রকমই হয়ে গেছে। আগে যদি জানতাম তুমি আসবে, তা হলে না হয় অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতাম—

—বরোদা বা গোয়ালিয়রের মহারাণীকে যেমন অভ্যর্থনা করে—বলে শীলা খুব হাসতে লাগল।

মা বললেন,—কি লক্ষ্মী মেয়ে,—এসেই আমার ঘরটা কেমন গুছিয়ে ফেলেছে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আগে লোকে নিন্দা করত লেখাপড়া-জানা মেয়েরা ঘরসংসারের কাজ করতে পারে না, কিন্তু এখন দেখছি সেটা ভুল কথা—

আমি বললাম,—সে কালে সরস্বতীদের এক হাতে থাকত বীণা, আর এক হাতে পুঁথি, অন্য কাজ করবেন কেমন করে! কিন্তু একালের সরস্বতীরা বীণাও বাজান, হাতাবেড়ীও ধরেন,—সব্যসাচীর মত দু'হাতেই তাঁরা তীর ছুড়তে পারেন।

শীলা ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল,—একালকার মেয়েরা এতটা ফেলনা নয় যে, তোমরা এমন বিদ্রূপ করবে! এই সীতা-সাবিত্রীর দেশে আমরাও ভেসে আসি নি—

—কি সর্ব্বনাশ! একালের মেয়েদের বিদ্রূপ করব, এত বড় স্পর্দ্ধা আমার! সীতা সাবিত্রী তো পুরাণের মধ্যে আত্মগোপন করেছেন—আর এঁরা যে জলজীয়ন্ত বর্ত্তমান, জীবনমরণের কাঠিই এঁদের হাতে!

বালির বাঁধ

মা আমাদের কথা শুনে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। শীলার চুল বাঁধা শেষ করে বললেন,—তুই বাপু বিমানের ঘরটা একদিন গুছিয়ে দে। ঠিক যেন আস্তাকুঁড়; কত কালের ধূলোবালি জঞ্জাল যে ওর মধ্যে জড়ো হয়েছে তার ঠিকানা নেই—

আমি বললাম,—তোমার অত্যাচারটা তো কম নয়, মা! অতিথিকে কোথায় আদর অভ্যর্থনা করবে, না, তাকে দিয়ে ঝি'র কাজ করিয়ে নিতে চাও—

মা একটু কুণ্ঠিত ভাবে বললেন,—ঠিক বলেছিস্ বাবা, মেয়ে এতক্ষণ এসেছে, কিছুই ওকে খেতে দিই নি—মিছির-জী—

শীলা লজ্জিত হয়ে বলল,—না না, কাকীমা। ওসব কিছু করতে হবে না—

আমি বললাম,—এ ভাব আবার তোমার কবে থেকে হল, শীলা? আগে তো আমার খাবার কেড়ে না খেলে তোমার মন সন্তুষ্ট হত না—

শীলা খিল খিল করে হেসে বলল,—সে সব ছেলেবেলার কথা এখনও তোমার মনে আছে?

তার পর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল,—মিছির-জীর দরকার নেই কাকীমা,—আমি নিজেই সব ঠিক করে নিচ্ছি। চাকর-বামুনের হাতের তৈরী জিনিষ আমি খেতে ভালবাসি না। তুমি ততক্ষণ হাত মুখ ধুয়ে এস বিমানদা—

আধ ঘণ্টা পরে যখন ফিরে এলাম, বিস্মিত হয়ে দেখলাম, শীলা ওরই মধ্যে একটা কাণ্ড করে তুলেছে। বললাম,—তুমি কি যাদু জান না কি শীলা—এমন সব উপাদেয় জিনিষ কোথা থেকে এল?

শীলা সলজ্জ হেসে বলল,—ওগুলো দেখে আশ্চর্য্য হবার জন্য করা হয় নি, খেয়ে পরীক্ষা করবার জন্য—

—বিশ্ববিদ্যালয়ে রান্নার কোন ডিগ্রী নেই, নইলে তুমি প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোমা পেতে পারতে।

মা কাছেই বসেছিলেন, আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন,—আমার কথা বিশ্বাস করতে চাস্‌নে, এবার তো হাতে হাতে প্রমাণ পেলি!

—তোমার কথা কবে অবিশ্বাস করেছি মা? তবে শীলার উপর তোমার যেমন পক্ষপাত, তাতে তোমার সার্টিফিকেটের কোন মূল্য দেওয়া যায় না।

শীলা হেসে বলল,—সার্টিফিকেট না হয় তুমিই পরে দিও, আপাততঃ এগুলো খেয়ে ফেল দেখি—

খেতে খেতে বললাম,—স্বর্গের অমৃতের কথা দিদিমার কাছে গল্পই শুনেছি,—কিন্তু সত্যিকার অমৃত বোধ করি, এই—

আমার দিকে একটু সরে এসে, মা যাতে শুনতে না পান এমনি নিম্নস্বরে শীলা বলল,—খোসামোদি বিদ্যাটা ভাল করেই শিখেছ দেখছি। এর পর যিনি তোমাকে শাসন করবার ভার নেবেন, তাঁর কাছে বিদ্যাটা কাজে লাগবে!—

আমিও তেমনই নিম্নস্বরে বললাম,—শাসনকরা বিদ্যাটা এখন থেকেই তুমি যেমন ভাবে প্র্যাকটিশ করছ, তাতে ভবিষ্যতে যে নাবালকটী তোমার শাসনাধীনে আসবেন, তাঁর জন্য আমার রীতিমত করুণা হচ্ছে—

বালির বাঁধ

শীলা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বলল,—কে আসবে না আসবে, সেই ভাবনায় আমার আর ঘুম হয় না—

মা বললেন,—শীলা, মা, তুই কিছু খেয়ে নে, সন্ধ্যা হয়ে এল, দিদি আবার ভাববেন।

*

* *

পর দিন মা বললেন,—আমার সঙ্গে আজ শীলাদের বাড়ী যাবি চল। আমি যেন একটু বিস্মিত হয়েই বললাম,—শীলা তো এই কালই এসেছিল, আজই আবার ওদের বাড়ী যাবার কি দরকার?

মা মৃদু হেসে বললেন,—দরকার অনেক রকম আছে, বাবা। তা ছাড়া দিদি আজ আমাদের দুজনকেই নিমন্ত্রণ করেছেন।

আমি চিন্তিতভাবে বললাম,—কিন্তু আমার যে কাজ আছে, একটা কঠিন রোগী আমার হাতে—

—রোগীকে না হয় খবর পাঠিয়ে দে, বিকালের দিকে যাবি। ওদের বাড়ী না গেলে তোমার জ্যেঠাইমা খুব রাগ করবেন।

মা যে বিয়ের সম্বন্ধটা পাকা করতে যাচ্ছেন, তা বুঝতে আমার অবশ্য কষ্ট হল না। কিন্তু মুখে কোনরূপ আগ্রহ না দেখিয়ে নির্লিপ্ত-ভাবে বললাম,—তবে চল, শীগ্‌গিরই আমাকে আবার ফিরতে হবে।

শীলাদের বাড়ীতে যখন গেলাম, তখন বেলা প্রায় দশটা। শীলা সন্ত স্নান করে একখানা খয়ের রঙের শাড়ী পরেছে। আলুলায়িত কেশজাল তার পৃষ্ঠে, বাহুতে কপোলে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রভাতের

বালির বাঁধ

নবারুণ দীপ্তি তার মুখে, দুই আয়ত চোখে পরিপূর্ণ জীবনের চাঞ্চল্য, অধরে স্নিগ্ধ হাসির রেখা। কোন চিত্রকর যদি তার সেই সময়ের ছবি এঁকে নীচে লিখে দিত 'যৌবন-শ্রী', তা হলে ঠিকই মানাত।

আমাকে দেখে তার চোখে মুখে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। কিন্তু সে ভাব দমন করে মাকে লক্ষ্য করেই সে বলল,—এস কাকীমা, মা তোমার কথাই এতক্ষণ বলছিল।

আমরা অন্দর মহলের আঙ্গিনাতে দাঁড়িয়েছিলাম। মা চার দিকে চেয়ে বললেন,—বিশ বছর আগে যেমন দেখেছিলাম, এখনও ঠিক তেমনই আছে। তুই তখনও হসনি শীলা, আমি মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন এই বাড়ীতেই কাটাতাম, আমাদের দেখে কেউ বুঝতে পারত না যে, আমরা দুজন মায়ের পেটের বোন নই—

বলতে বলতে মা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

মার গলার স্বর শুনে জ্যাঠাইমা বের হয়ে এলেন।

—এই যে শৈল এসেছিস। দেরী দেখে ভাবলাম, তুই বুঝি আর আসবি নে। তারপর মার দিকে ভাল করে দৃষ্টি পড়তেই বললেন,—এমন চেহারা হয়েছে কেন তোর,—তীর্থে তীর্থে ঘুরে তপস্যা করছিস না কি?

মা বললেন,— মন স্থির করে তীর্থ করতে পারি কৈ দিদি! এদের কথা ভেবে মাঝে মাঝে উদ্বেগের সীমা থাকে না, ছুটে আসতে হয়।

—যাতে তোর উদ্বেগ দুর হয়, সেই ব্যবস্থাই এবার করছি।

জ্যাঠাইমার মুখ সস্নেহ কৌতুক হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মার

হাত ধরে তিনি বললেন,—চল, আমরা দু'বোনে নিরালায় বসে সুখ দুঃখের কথা বলি গে। শীলা মা, বিমানকে একটু আদর অভ্যর্থনা কর।

আমি হেসে বললাম,—জ্যাঠাইমার বাড়ীতে আদর অভ্যর্থনার কবে অভাব হয়েছে যে,—আজ বিশেষ করে তার আয়োজন করতে হবে!

জ্যাঠাইমা সস্নেহে একটু হাসলেন, কিছু বললেন না।

তাঁর বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, চুল প্রায় অর্দ্ধেক পেকে গেছে। কিন্তু তাঁর সেই প্রৌঢ়ত্বের মধ্যে এমন একটা শান্ত সুষমা আছে যে, দেখলে মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠে। লোকে যৌবনের সৌন্দর্য্য গান করতেই অভ্যস্ত, কিন্তু প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য আছে, তা সকলের চোখে পড়ে না। পূর্ণিমার চাঁদের শোভাই লোকে দুই নয়ন ভরে পান করে, কিন্তু রাত্রিশেষে অস্তগামী চন্দ্রের যে শোভা, তারও তুলনা নেই!

শীলার পড়ার ঘরে গিয়ে বসলাম। সে বলল,—ভালই হল, তুমি এসেছ। আজ তোমাকে সমস্ত দিন এখানে আটকে রাখব,—যেমন আস না, তার শাস্তি।

—কিন্তু—

—কোন কিন্তু শুনতে চাইনে—বলে শীলা দেরাজ থেকে একখানা বাঁধানো খাতা টেনে বের করল।

বুঝলাম,—বুদ্ধিমানের মত এই বন্দীদশা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বালির বাঁধ

শীলা বলল,—আমাদের কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে তর্ক উঠেছে, শেলী বড়, না, রবিবাবুই বড় ? আমি ওই নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছি—

একটু হেসে বললাম,—তুমি কাকে বড় ব'লে সাব্যস্ত করলে ?

—আমার মতে রবিবাবুই বড়। শেলীও বড় কবি সন্দেহ নাই, কিন্তু রবিবাবুর মত এমন বহুমুখীপ্রতিভা তাঁর ছিল না। কেমন ঠিক বলিনি ?

—আমি ডাক্তার মানুষ, ল্যান্সেট, ষ্টেথস্‌কোপ নিয়েই আমার কারবার, কাব্যের ধার ধারিনে। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, —টাইফয়েড আর কলেরা, এ দুয়ের মধ্যে কোনটা শক্ত রোগ,—তা হলে বলব, দুই-ই সমান !

শীলা আমার মুখের দিকে সংশয়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, —তার মানে ?

—ডাক্তারী উপমাটা বুঝি পছন্দ হল না ? তা হলে আর একটা উপমা দিই। সকাল বেলার ভৈরবী রাগিণী শুনে কারু চিত্ত আলোড়িত হয়ে ওঠে, আবার কেউ বা অপরাহ্ণের পূরবীর সুরে আত্মহারা হয়। তাই বলে দুয়ের তুলনা চলে না।

শীলা গম্ভীর ভাবে বলল,—কিন্তু দুই-ই প্রেমের কবি, একজনের মধ্যে চিরবিরহের সুর, আর একজনের মধ্যে চির মিলনের আনন্দ !

—তার চেয়ে বল, একজন বর্ষার কবি, আর একজন বসন্তের দূত।

শীলা রাগ করে বলল,—যাও, তোমার সব তাতেই হেঁয়ালী ! তোমাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাই বৃথা—

—হুঁ, ওর বদলে মিঃ নাগকে জিজ্ঞাসা করলে অনেক সদুপদেশ

পেতে পারতে। এমন কি, বিলাতের ডেইজী ফুল যে আমাদের গোলাপের চেয়েও সুন্দর, তা তিনি আশ্চর্য্যরূপে প্রমাণ করে দিতেন।

শীলা আমার দিকে একটা ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তার পর দ্রুত পদে ঘর থেকে চলে গেল। আমি উচ্চহাস্য করে উঠলাম।

দশ মিনিট পরে শীলা আবার ফিরে এল। আমি তার পদশব্দ শুনেই একখানা বই হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে সুরু করে দিলাম।

শীলা আমার কাছে এসে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল,—রাগ করেছ? আমি ভারী দুষ্টু। কিন্তু তুমি মিঃ নাগের কথা বলে আমাকে চটিয়ে দাও কেন, বলত?

চেয়ে দেখলাম, শীলার মুখে একটা করুণ বিষাদের ছায়া, দু চোখ ছল ছল করছে। অনর্থক ওর মনে আঘাত দিয়েছি বলে বড় মমতা হল। ওর ফুলের মত নরম একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম,—আচ্ছা, আর বলব না, ক্ষমা চাইছি!

শীলার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল।

অপরাহ্ণে শীলা বলল,—চল না আমার সঙ্গে 'গাইড' হয়ে যাবে—

—কোথায় যাবে তুমি—

—আমার বন্ধু সুমিত্রার বাড়ী কাশীপুরে—

আমি দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে বললাম,—কিন্তু ফিরতে তো দেরী হবে—

বালির বাঁধ

—কিছু দেরী হবে না, দুঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। আর হলই বা দেরী, তোমার হাতে তো এখন কোন কাজ নেই—

গুরুতর কাজই ছিল হাতে, প্রভার স্বামীর কাল থেকে কোন খবরই নেওয়া হয় নি। কিন্তু শীলার অভিমানে ভারী মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম, কোন আপত্তি টিকবে না। অগত্যা একটু উৎসাহের ভাব দেখিয়েই বললাম,—

—বেশ ত চল,—তোমার বন্ধুটীর সঙ্গেও আলাপ করে আসব।

—তা হলে তুমি গাড়ীটা নামাতে বল,—আমি কাপড় ছেড়েই আসছি!

শীলা যখন ফিরে এল, তার দিকে চেয়ে ক্ষণকাল আমি দৃষ্টি ফিরাতে পারলাম না। তার নীলাভ রঙের শাড়ীতে, এলো খোপায়, সুবলয়িত বাহুতে, সুঠাম দেহলতায় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ উঠেছিল। সে সৌন্দর্য্য প্রাণ দিয়ে অনুভব করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

শীলা গাড়ীতে বসে বলল,—এইবার চল—

আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, তার কথার কোন উত্তর দিলাম না।

আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে শীলা বলল,—কি ভাবছ, এইখানেই বসে থাকবে নাকি ?

আমি অপ্রতিভ ভাবে বললাম,—এই যে যাই—

গাড়ী বেগে চালিয়ে দিলাম।

শীলা আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল,—সুমিত্রার আসছে মাসেই

বিয়ে হবে, বর পাড়াগাঁয়ের জমিদার। আমি ভাবছি, ও কলেজে পড়া সহুরে মেয়ে, কি করে সেই পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকবে!

বললাম, পাড়া গাঁ কি সুন্দরবনের মত একটা ভয়ঙ্কর জায়গা নাকি? বাঙ্গলা দেশের বেশীর ভাগ লোকই তো পাড়াগাঁয়েই থাকে।

—যারা থাকে থাক, আমি কস্মিন কালে পাড়াগাঁয়ে যেতে পারব না। তা ছাড়া এই যে ধরে বেঁধে বিয়ে, এ আমি মোটেই পছন্দ করি নে। যাকে কোন দিন দেখিনি, যার সম্বন্ধে কিছুই জানিনে, বাপ মা নির্ব্বিচারে তার হাতেই সঁপে দিলেন, আর আমাকে চোখ বুঁজে তাই মেনে নিতে হবে, এর চেয়ে অন্যায় আর কিছু হতে পারে না।

—কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ বিয়েই তো এই ভাবেই হচ্ছে!

শীলা ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল,—সেই জন্যই অধিকাংশ বিয়ে সুখের হয় না।

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম,—মানুষ যে কিসে সুখী হয়, তা ঠিক বলা যায় না শীলা। বাল্যের প্রেম যৌবনে এসে ম্লান হয়ে যায়, সংসারের ঝড়-ঝাপটায় তার ক্ষীণ দীপ শিখা নিবে যায়—

শীলা ঈষৎ বেদনাহত স্বরে বলল,—তোমার কথা শুনে মনে হয়, মানুষের উপর তোমার শ্রদ্ধা নেই, ভালবাসায় তুমি বিশ্বাস কর না!

—করতাম, কিন্তু সংসারের কঠিন অভিজ্ঞতা যতই হচ্ছে ততই সংশয় ও সন্দেহ জেগে উঠছে। অনেক সময় ভাবি, আমাদের আশা

আকাঙ্ক্ষা দিয়ে কল্পনা দিয়ে, আমরা যে মায়ালোক রচনা করি, তার মূলে হয়ত কোন সত্য নেই!

শীলা বলল,—দেখছি, তুমি কেবল কবি নও, একজন উঁচুদরের দার্শনিকও! কিন্তু সবই যদি মায়া, তবে তুমি আমিও ত মায়া—

বলে শীলা হেসে উঠল। তার বাহু আমার বাহুতে স্পর্শ করেছিল, চূর্ণকুন্তল বাতাসে উড়ে আমার কপোলে স্কন্ধদেশে পড়েছিল।

আমি শীলার কথায় কোন উত্তর দিলাম না। সে আমার দিকে আর একটু ঘেঁসে এসে বলল,—বুঝলাম, প্রেম জিনিষটা তুমি পছন্দ কর না—খাঁটী আর্য্যপ্রথার তুমি ভক্ত। কিন্তু কি রকমটী হলে তোমার পছন্দ হয়, খুলেই বলনা। তেমন একটী মেয়েই খুঁজে বের করি!

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললাম,—খুঁজতে হবে না, খোঁজাই আছে।

শীলা গভীর বিস্ময়ের ভান করে বলল,—ওমা, তাতো এতদিন জানতাম না। কে সে মেয়েটী বলত?

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব রহস্যময় করে বললাম,—সময় হলেই জানতে পারবে,—কিন্তু বড় বাজারের ঘাটে এসে পড়লাম যে—

একখানা যাত্রী ষ্টীমার ছাড়ছিল কাশীপুরের দিকে। শীলা বালিকার মত উৎসাহে বলে উঠল,—চল না, ওই ষ্টীমারেই যাই—বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে—

—কিন্তু গাড়ীটা?—

গাড়ীটাকে বলে দিই সোজা কাশীপুরে সুমিত্রাদের বাড়ী যেতে—ফিরবার সময় গাড়ীতেই আসব।

আমি কোন আপত্তি করলাম না, ওর ইচ্ছায় আজ আমি কোন বাধা দেব না।

ষ্টীমার কাশীপুরের দিকে উজিয়ে চলল। উপর তলায় সেদিন আমরা দুজন ছাড়া আর কোন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ছিল না।

সম্মুখে দূরপ্রসারিত গঙ্গার বারিরাশি, উপরে দিগন্তবিস্তৃত নীলাকাশ, দুই তীরে কলকারখানার চূড়া আকাশ ভেদ করে উঠেছে। ঘাটে ঘাটে নৌকার ভীড়, লোকের ভীড়। আমার মনে হল আকাশে বাতাসে আজ যেন কিসের একটা উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে— আমরা দুজনে সেই উৎসবের প্রধান যাত্রী।......এত কাছে, এমন নিবিড় ভাবে—শীলাকে বুঝি আর কখন পাই নি। একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আমার সমস্ত সত্ত্বা পূর্ণ হয়ে উঠল, সে আনন্দ উপভোগ করতেও যেন আমার ভয় হচ্ছিল! একি স্বপ্ন, না, সত্য! বাস্তবের কঠিন বাঁধন বাঁধতে গেলেই এ যদি রামধনুর বিচিত্র বর্ণের মত,— গোধুলীর সোনালী রঙের মত শূন্যে মিলিয়ে যায়?

সেও কি মনে মনে এমনই আনন্দ অনুভব করছিল? এমনই সংশয় আশঙ্কা তার মনের উপর ছায়াপাত করেছিল?

দুজনে পাশাপাশি ডেকের উপরে বসেছিলাম। গঙ্গার বারিরাশির বুকে মৃদুবীচিবিক্ষোভ, নীলাকাশের গায়ে সাদামেঘের খেলা, দেখে যেন আর তৃপ্তি হচ্ছিল না। এমন একটা সীমা আছে যার বাইরে গেলে ভাষা ভাবকে আর প্রকাশ করতে পারে না, তার পুঁজিপাটা সব নিঃশেষ হয়ে যায়। আমাদেরও মনের বুঝি সেই দেউলিয়া অবস্থা হয়েছিল। দুজনেই দুজনের অন্তরের গভীরতম

স্পন্দন পর্য্যন্ত অনুভব করছিলাম, কিন্তু কেউই কথা বলবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ইচ্ছা হচ্ছিল সেই ভাষাহীন নিবিড় মৌন আনন্দের মধ্যেই যেন অনন্ত কাল ডুবে থাকি।······

ষ্টীমারের গতিপথের মুখেই পড়েছিল একখানা যাত্রীবাহী ডিঙ্গী নৌকা। দুটী তরুণ-তরুণী সেই নৌকার মধ্যে বসেছিল। তরুণীর মুখের স্বল্পাবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, নববধূর সলজ্জ ভাব এখনও তার ভাল করে কাটেনি। ঢেউয়ের তালে তালে নৌকা যখন প্রবল বেগে দুলতে লাগল,—তরুণী কাছে ঘেঁসে কাঁকণ পরা দুই সুগোল বাহু দিয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরল। ওর মধ্যে সবখানিই যে ভয় নয়, নির্ভরতার একটা আনন্দও ছিল, তার হাস্যো-জ্জ্বল মুখের মধুর দীপ্তিতেই তা প্রকাশ পাচ্ছিল।

শীলা বলল,—দেখ, দেখ, এরা দুজনে কি সুখী, মানুষের জীবনে এই তো আনন্দ!

আমি ঈষৎ হেসে বললাম,—এই ঢেউয়ের তালে তালে দোলা?

—সত্যিই তাই! জীবনে দুঃখের অন্ত নেই, চারি দিক থেকে তারা আঘাতে আঘাতে জীর্ণ তরী খানা চূর্ণ করতে চাইছে; ওরই মধ্যে যদি এমন কাউকে পাওয়া যায়, যার উপর নির্ভর করা যায়, দুঃখের অংশ যে হাসিমুখে ভাগ করে নিতে পারে—

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম,—যদি তরঙ্গে তরী ডুবে যায়?—

—ক্ষতি কি? দুজনেই এক সঙ্গে ডুববে!

ছোট নৌকাখানা ঢেউয়ের আঘাতে দুলতে দুলতে দূরে সরে গেল।

যতক্ষণ দেখা যায়, এক দৃষ্টে সেই দিকেই চেয়ে রইলাম। তার পর ধীরে ধীরে বললাম,—

—আমার উপর তোমার তেমন বিশ্বাস হয়, শীলা ?

শীলা দুইচোখ বিস্ফারিত করে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর মৃদু হেসে বলল,—

—রাম সীতাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন নি, তাঁর অগ্নি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন,—কিন্তু সীতা তো রামের উপর মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস হারান নি—

হঠাৎ কথাটা বলে ফেলেই শীলার বোধ হয় খুব লজ্জা হল, তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। বিষয়টা তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্য সে বলল,—

—ওই দেখ কাশীপুর ঘাটে সুমিত্রা আর তার ছোট ভাই দাঁড়িয়ে। ড্রাইভারের কাছে খবর পেয়েছে নিশ্চয় !

চেয়ে দেখলাম, একটী সুবেশা সুন্দরী তরুণী ও একটি প্রিয়দর্শন কিশোর বালক নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

ষ্টীমার কাশীপুর ঘাটে গিয়ে ভিড়ল।

*

* *

রাত্রে বাড়ী ফিরতে দেরী হল। জ্যাঠাইমা না খাইয়ে কিছুতেই ছেড়ে দিলেন না। জ্যাঠামশায় রাত্রি ৯টার আগেই আহার শেষ করেন, সে নিয়মের কোন দিন ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু আজ তিনি নিয়ম ভঙ্গ করে আমার সঙ্গে খেতে বসলেন। জ্যাঠামশায়কে ছেলেবেলা থেকেই ভয় করে চলতাম। তাঁর গম্ভীর মুখ দেখলেই মনে একটা সম্ভ্রমের উদয় হত। কিন্তু আজ তাঁর গাম্ভীর্য্যের বাঁধ যেন একটু আলগা হয়ে পড়েছিল। বাইরের কঠিন আবরণ ভেদ করে, মনের গভীর স্তর থেকে আজ যেন তাঁর আসল ভাবটী বেরিয়ে এসেছিল। এই গুরু-গম্ভীর বনিয়াদী চালের লোকটীর বাহিরটা যতই কর্কশ হোক, ভিতরে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত স্নেহ ও মমতার ধারা বইছে, এ আমি আজ প্রাণ দিয়ে অনুভব করলাম। যে লোকের নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায় বলে প্রবাদ, বিদ্রোহী প্রজা দমন করবার সময় নির্ম্মম নিষ্ঠুর হতেও যিনি কুণ্ঠিত হন না, তাঁরই মন আবার স্নেহে এমন কোমল, আশঙ্কায় এমন ব্যাকুল!

বালির বাঁধ

খেতে খেতে জ্যাঠামশাই বলছিলেন,—শীলা আমার এক মাত্র সন্তান, বাবাজী! আমার যাকিছু আছে, সবই ওর,—তোমার হাতে ওকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই, আমি জানি, তুমি ওর অযত্ন করবে না—

জ্যাঠাই মা বললেন,—আমি অনেক সময় ভাবি, বিধাতা ওদের দুজনকে পরস্পরের জন্যই তৈরী করেছিলেন। আমার শীলা যে অন্য কারু হাতে পড়বে, এ আমি কোন দিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নি!

আমার তখনকার মনের অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করবার নয়। লজ্জা ও আনন্দের মিশ্রণে যে একটা নূতন ভাবের সৃষ্টি হয়, মনস্তত্ত্ব-বিদেরা তাকে কি বলবেন জানি না; কিন্তু আমার মন সেই অপরূপ ভাবের রসে ডুবে গিয়েছিল। মাথা তুলে কারুরদিকে চাইতে পারছিলাম না।

শীলা সেখানে ছিল না, কিন্তু তার অস্তিত্ব আমি বেশ অনুভব করছিলাম। আশে পাশের কোন দরজা বা জানলার আড়ালে সে লুকিয়ে আছে, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। তার হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে কি ভাবের খেলা চলছিল? যদি সেই রহস্যময় লোকে প্রবেশ করতে পারতাম!

আসবার সময়ও শীলাকে কোথাও দেখতে পেলাম না, বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরের বাগানে ফটকের কাছাকাছি একটা মাধবী-লতার কুঞ্জ ছিল, তার তলাটা বাঁধানো। দেখি শীলা একলা সেখানে বসে আছে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম,—কে শীলা? এখানে যে?

শীলা মৃদু হেসে বলল,—তোমাকে দেখব বলে!

—আমাকে সারাদিনই তো আজ দেখেছ,—ভবিষ্যতে সব সময়েই যাতে দেখতে পার, তারও পাকা বন্দোবস্ত হচ্ছে!

শীলা কৃত্রিম কোপের সঙ্গে গ্রীবা বাঁকিয়ে বলল,—যাও!

আমি মুগ্ধচিত্তে তার সেই বঙ্কিম গ্রীবা ভঙ্গীর দিকে চেয়ে দেখছিলাম। তার চোখে চোখ পড়তেই সলজ্জ হেসে সে বলল,—কাল কিন্তু আসা চাই-ই, একটা নূতন জায়গায় বেড়াতে যেতে হবে—

—কোথায় বলনা?

—সে এখন বলব না!—হাসতে হাসতে সে ছুটে অন্দরের দিকে চলে গেল।

আমি কিছুক্ষণ তার সেই গতিপথের দিকে চেয়ে রইলাম। কোন নিপুণ শিল্পী—তার তুলির টানে একটা সৌন্দর্য্যের রেখা যেন আমার সম্মুখে এঁকে দিয়ে গেল!

প্রভা

কিছুতেই ধরে রাখতে পারলাম না। সমস্ত রাত লড়াইয়ের পর ভেবেছিলাম, মৃত্যুর দূত বুঝি ফিরে গেল। বুঝি আরও কয়েকটা দিন এ পৃথিবীতে ওর থাকবার জন্য অনুমতি মিলল। কিন্তু মিথ্যা আশা! মৃত্যুর দূত অৰ্দ্ধপথে গিয়েই পরদিন আবার ফিরে এল, তার কালো ছায়া ক্রমে দীর্ঘতর হয়ে সব আচ্ছন্ন করতে লাগল। আমার চোখের উপর সব শেষ হয়ে গেল!···

সব অসার নিস্পন্দ হিম শীতল,—জীবনের চিহ্নমাত্র নেই, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ মুক্তি পেয়ে কোন অনন্ত আকাশে মহাযাত্রা করেছে। আর সে ফিরবে না,—ফিরবে না! ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু কান্নাও বুঝি ভয়ে স্তব্ধ হয়েছে, অশ্রু জমে বরফ হয়ে গেছে।

গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার। আলোকের ক্ষীণরেখা, জীবনের ক্ষীণতম চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত কোথাও নাই। সমস্ত বাড়ীটা যেন ছম ছম করছে, ছায়ামূর্ত্তির মত কারা সব চারিদিকে ঘুরছে, ফিস ফিস করে চুপি চুপি কথা বলছে,—জানলা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে। যে দেহের উপর জীবনের আর কোন অধিকার নেই, ওরা কি তাকেই দাবী করতে এসেছে?

অদূরে একটা নিশাচর পাখী সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করে ভয়ার্ত্ত স্বরে ডেকে উঠল, তার পর সেই অন্ধকারের মধ্যেই ডানা ঝট পট করে কোথায় উড়ে গেল! বহুদূর পর্য্যন্ত তার পাখার শব্দ স্পষ্টই শুনতে পেলাম। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। সেই অন্ধকার পুরীতে মৃতদেহ নিয়ে সমস্ত রাত্রি কি করে কাটাব! কিন্তু আমার তো কেউ নেই—একান্ত অসহায়, নিরুপায় নারী আমি!

সহসা ডাক্তারের কথা মনে পড়ল। একমাত্র সে-ই যদি এ বিপদে আমাকে সাহায্য করতে পারে।—কিন্তু সে ত দুদিন হল আসে নি—হয়ত আর আসবে-ও না।···কেমন ডাক্তার সে—মুমূর্ষু রোগীকে দেখে গেল, অথচ একটা খবর পর্য্যন্ত নিল না! ডাক্তারের উপর বড় রাগ হল।

পরক্ষণেই মনে হল, ডাক্তার আমার কে? কেনই বা সে এই পরের বোঝা বইতে আসবে? তার উপর রাগ করবার আমার কি অধিকার? গরীবের উপর বড় লোকের একটু দয়া হয়েছিল, কিন্তু সকাল বেলার শিশির বিন্দুর মত এতক্ষণে বাষ্প হয়ে তা কোথায় মিলিয়ে গেছে!

অন্ধকার আকাশের বুক চিরে যেমন বিদ্যুৎশিখা চমকে উঠে, তেমনি অকস্মাৎ আমার মনে হল,—সে কি শুধু দয়া? ডাক্তার কি শুধু দয়া করে এ বাড়ীতে আসত,—দয়া করে সমস্ত রাত্রি রোগী নিয়ে বসে ছিল? অথবা—অথবা—কথাটা বেশীদূর চিন্তা করতেও সাহস হল না।···না, ওর আর এসে কাজ নেই, আমি একাই এই মৃতদেহ নিয়ে অনন্ত কাল বসে থাকব, আমার অদৃষ্টে যা ঘটবার ঘটবে!

কতক্ষণ এই ভাবে কেটেছিল জানি না;—নীচে কার কণ্ঠস্বর শুনে

চমকে উঠলাম ! সিঁড়ি বেয়ে জুতার শব্দ উপরে আসতে লাগল। সে-ই ত এসেছে !···এবার মনকে শক্ত করতে হবে—ওর মিষ্টি কথায় ভুললে চলবে না। আমি কোন সাড়া দিলাম না, তেমনি নিশ্চলভাবে মৃতদেহের কাছে বসে রইলাম।

ডাক্তার ধীরে ধীরে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল,—ক্ষীণ আলোকে একবার দেখেই বুঝতে পারল মৃত্যুরই জয় হয়েছে। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল,—এই আশঙ্কাই আমি করেছিলাম ! কিন্তু আমাকে একটা খবর দিলে না কেন, প্রভা ?

আমি কোন উত্তর দিলাম না, ডাক্তারের দিকে ফিরেও চাইলাম না। সে কি জানে না, খবর দেবার উপায় আমার নেই !

ডাক্তার কিছুক্ষণ নীরব থেকে, একটু ইতস্ততঃ করে বলল,—এখন তো এমনি করে বসে থাকলে চলবে না,—শেষ কাজ করতেই হবে—

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, বিরক্তভাবে বললাম,—আপনাকে কিছুই করতে হবে না, কিছু করবার জন্য আপনাকে আমি ডাকিও নি। রোগী মরে গেলেও কি তাকে রেহাই দেবেন না ?

ডাক্তার কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে শান্তভাবে বলল,—তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, প্রভা ! কিন্তু ভগবানের বিরুদ্ধে লড়াই করে তো লাভ নেই, এখন মানুষের যা কর্ত্তব্য তাই করতে হবে।

অদ্ভুত এই লোকটা ! এর কি আত্মসম্মান জ্ঞান বলে কিছু নেই ? তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললাম,—আপনার দয়া আমি চাই না ! যা করেছেন তার জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ, কিন্তু আর নয়, ডাক্তারের ফি দেবার সাধ্য আমার নেই !

আড়চোখে চেয়ে দেখলাম,—ডাক্তারের মুখ কালো হয়ে গেছে, সে যেন অতিকষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ভাবলাম, এবার আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় নি, তীরটা ঠিক জায়গায় বিঁধেছে। মনে একটা ক্রুর উল্লাস হল।

ডাক্তার কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে, বোধ করি, আঘাতটা সামলে নিয়ে বলল,

—তোমার সমস্ত তিরস্কার আমি মাথা পেতে নেব, প্রভা। কিন্তু এই জনমানবশূন্য বাড়ীতে অন্ধকার রাত্রে তুমি একা মৃতদেহ নিয়ে বসে থাকবে, আর আমি তোমাকে ফেলে চলে যাব,—এ কিছুতেই পারব না,—তুমি বললেও না! তোমার ভয় নাই, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।

আমার কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে ডাক্তার চলে গেল। তার কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, একি দেবতা, না, দানব? সাধারণ মানুষের তো এমন ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা সম্ভবপর নয়! ওকে অনর্থক কতকগুলো কটু কথা বলেছি বলে মনে একটু অনুতাপই হল। সত্যিই তো, প্রথম থেকে প্রাণ দিয়ে যে ভাবে আমার জন্য করছে, এমন তো কেউ করে না। ভগবান আমার চরম বিপদের দিনে ওকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন,—আর আমি তার জন্য বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরে থাক, কেবলই নিষ্ঠুর ভাবে ওকে আঘাত করছি!

কতক্ষণ একা এইভাবে বসেছিলাম, জানি না,—মনে হচ্ছিল যেন যুগের পর যুগ চলে গেল, এ প্রতীক্ষার আর শেষ নাই! অন্ধকারে নিশাচর প্রাণীদের, কীটপতঙ্গের সঞ্চরণ শব্দে এক একবার চমকে উঠছিলাম,—পরক্ষণেই আবার তেমনই গভীর নিস্তব্ধতা!

অবশেষে ডাক্তার জনকয়েক লোক নিয়ে ফিরে এল। আমি চোখ বুজে বসে রইলাম, সে দৃশ্য চেয়ে দেখবার ক্ষমতা আমার ছিল না!

অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় শ্মশান ঘাটে বসেছিলাম। কি যে হচ্ছিল, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। শেষে যখন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কাজ করবার জন্য আমার ডাক পড়ল, আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়লাম। ওঃ, ভগবান, ভগবান,—যে নিষ্ঠুর এই নিয়ম তৈরী করেছিল, তার হৃদয়ে স্নেহভালবাসা, মায়ামমতা বলে কিছুই ছিল না। না—না, এ আমি কিছুতেই পারব না—পারব না!

কিন্তু নিষ্কৃতি নেই,—যেমন করেই হোক, সবই আমাকে করতে হল। যে মুখের দিকে কতদিন নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখেছি, তাতেই নিজের হাতে—

সব শেষ—সব শেষ! গঙ্গার অনন্ত প্রবাহের মধ্যে শেষ ভস্মরাশি নিক্ষেপ করে আবার সেই পরিত্যক্ত গৃহে ফিরে এলাম।

*

* *

অন্ধকার রাত্রে অকুল সমুদ্রে জাহাজ ডুবে গেলে হতভাগ্য যাত্রীদের অবস্থা বুঝি এমনই হয়! যে দিকে দৃষ্টি ফিরাই, কোন আশা নাই, ভরসা নাই, এ সংসারে আপনার বলতে কেউ নাই! যাকে আশ্রয় করে এই সমুদ্রে তরী ভাসিয়েছিলাম, তার অভাবে সবই অর্থহীন, শূন্য। এই বাড়ী আমার কাছে আজ শুধু ইট কাঠ পাথরের স্তূপ,—পরিত্যক্ত জীর্ণবস্ত্রের মত এর উপর আমার আর কোন মায়া নেই। জীবনের চৌদ্দ বৎসর যেখানে কাটিয়েছি,—আমার সমস্ত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নজাল যার চার দিকে ঘিরে তৈরী করেছি,—আজ তা যেন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

দশ বছরের মেয়ে আমি,—লাল চেলী পরে এই বাড়ীর আঙ্গিনায় পাল্কী থেকে যখন নেমেছিলাম,—তখন কি আনন্দ কলরবের মধ্যেই না সকলে আমাকে বরণ করে নিয়েছিল! তখন তো এ বাড়ী ছিল আনন্দের হাট, আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব পরিজন দাসদাসী পাইক বরকন্দাজে বাড়ী যেন গম গম করত, এর আকাশে বাতাসে প্রাণের স্রোত

বইত। সেই লালচেলী-পরা বালিকা বধূকে কোলে তুলে নিয়ে শ্বাশুড়ী বললেন,—আমার তো মেয়ে ছিল না,—আজ থেকে তুমিই আমার মেয়ে।

শ্বশুর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন,—এত দিন পরে স্বয়ং মা লক্ষ্মী এসে আমার বাড়ীতে বাঁধা পড়লেন!

মাবাপ-মরা মেয়ে, মামার বাড়ীতে মানুষ হয়েছিলাম,—মা বাপ পেয়ে নূতন করে জীবন আরম্ভ হল আমার। সেই যে এসেছিলাম,—তার পর এই চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে আমি একদিনও এ বাড়ী ছেড়ে যাইনি। এ গৃহ যে আমার তীর্থ,—আমার স্বর্গ! এর প্রত্যেক ঘর, বারান্দা, জানলা,—এর সমস্ত আসবাবপত্র, ইট কাঠ পাথর, ধূলি-কণাটী পর্য্যন্ত যে আমার অন্তরের সঙ্গে গাঁথা, আমার বত্রিশ নাড়ীর সঙ্গে তাদের বন্ধন।

সকালবেলা বাগানের দেবদারু গাছের মাথায় সর্ব্বপ্রথম যে সোনালী রোদ পড়ত, সন্ধ্যাবেলা মালতী কুঞ্জের উপর থেকে যে অস্তরাগ নেমে যেত,—তার প্রত্যেকটী বর্ণ, প্রত্যেকটী রেখাই যে ছিল আমার পরিচিত। বিশেষ করে ফুলের বাগানটী ছিল আমার পরমস্নেহের জিনিষ। দুবেলা আমিই সেখানে নিজের হাতে জল দিতাম। আমার হাতে জলের ঝারি দেখলেই দাসীরা ছুটে আসত,—বলত,—বৌরাণী, আমরা থাকতে তুমি নিজে জল দিলে লোকে বলবে কি? আমি মৃদু হেসে বলতাম,—বলবে, ওদের বাড়ীর বৌকে ওরা ফুলগাছে জল না দিলে খেতে দেয় না! শ্বাশুড়ী এ কথা শুনে স্মিত মুখে বলতেন,—আর জন্মে ও ছিল মালীদের মেয়ে, তাই ফুল বাগানের দিকে এমন ঝোঁক!

বালির বাঁধ

শ্বশুর শ্বাশুড়ী আমার কোন সাধই অপূর্ণ রাখেন নি,—সোনা জহরতে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত মুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবু তাঁদের মন উঠ্‌ত না,—একটী মাত্র বৌ, কি করে যে মনের আকাঙ্ক্ষা মিটাবেন, বুঝতে পারতেন না।

সবই তাঁরা আমাকে দিয়েছিলেন,—কেবল একটী জিনিষ দিতে পারেন নি,—নারীর কাছে যা সব চেয়ে মূল্যবান, সব চেয়ে আকাঙ্ক্ষার বস্তু,—যার অভাবে সমস্ত ধনরত্ন, হীরাজহরৎ তুচ্ছ হয়ে যায়! হীরাজহরৎ ধনরত্ন বাইরের অভাব হয়ত পূর্ণ করতে পারে, কিন্তু নারীর মনের ক্ষুধা মিটাতে পারে না।

ওকে যখন প্রথম দেখলাম, বালিকার চোখে পরম বিস্ময় লাগল। ষোল বছরের কিশোর, কাঁচা সোনার মত রঙ—যেন সাক্ষাৎ কিশোর কন্দর্প। দূর থেকে বড় ভাল লাগত, কিন্তু লজ্জায় আমি কাছে যেতাম না,—বৌ মানুষ, দেখা হলেই ঘোমটা টেনে ছুটে পালাতাম। শ্বাশুড়ী সস্নেহে হেসে বলতেন,—ওমা, ছুটে পালাস্ কেন—তোর আবার এত লজ্জা কিসের? কিন্তু ও তো কোন দিনই আমাকে চায় নি, লজ্জা ভাঙ্গবার কোন চেষ্টাও করে নি। হীরাজহরৎ-মোড়া মেয়েটীকে বড় লোকের বাড়ীর আর দশটা আসবাবের মতই বোধ হয় মনে ভাবত।

কৈশোর ছেড়ে যৌবনে যখন পা দিলাম, চোখে আমার যেন নূতন রঙ লাগল, পৃথিবীকে নূতন দৃষ্টিতে দেখলাম। মনে একটা কিসের তৃষ্ণা, কিসের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। ভাবতাম, যদি ওকে কাছে পেতাম, তাহলে বুঝি মনের সেই তৃষ্ণা মিটত। কিন্তু ধনীর নন্দ-দুলাল, বাইরে বন্ধুবান্ধব আমোদপ্রমোদ নিয়েই তার সময় কাটত,

তরুণী পত্নীর সঙ্গে ভাব করবার সময় তার কোথায়? অধিকাংশ রাত্রেই সে বাড়ী থাকত না,—যে দিন বা থাকত, বাইরের মহলে বন্ধুবান্ধব নিয়েই কাটাত। তার উচ্ছৃঙ্খলতার কত রকম কাহিনী যে কানে আসত, বলা যায় না। কতক বুঝতাম, কতক বুঝতেও পারতাম না। অভিমানে আমার বুক ফুলে উঠত। কিন্তু কার উপর অভিমান করব,—কে আমার মনের ব্যথা বুঝবে? সমস্ত রাত্রি বিফল প্রতীক্ষায় জেগে শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়তাম!—একটা দাসী মেঝেতে পড়ে ঘুমাত,—মাঝে মাঝে সে আমাকে সান্ত্বনা দিত, বৌ রাণী, তুমি দুঃখ করো না, দাদাবাবুর বুদ্ধি একদিন ভাল হবে, তোমার মর্ম্ম বুঝবে। কিন্তু হায়, তার সে আশার বাণী কোন দিন সফল হল না!

তারপর একদিন সংসারে দুর্য্যোগ ঘনিয়ে এল, ভাগ্যাকাশে মেঘ জমে উঠল, লক্ষ্মী তাঁর সোনার ঝাঁপি নিয়ে অন্তর্হিত হলেন। কোন যাদুমন্ত্র বলে ধন ঐশ্বর্য্য বিলাস বৈভব কোথায় মিলিয়ে গেল,—সেই আনন্দময় আলোকোজ্জ্বল পুরী নিরানন্দ অন্ধকারময় হয়ে গেল!

দারিদ্র্য কি তা শুনেছিলাম, তার ছায়া মূর্ত্তিও দেখেছিলাম; কিন্তু সে যখন আজ সামনে এসে দাঁড়িয়ে মুখের আবরণ টেনে ফেলে দিল, তার ভীষণ কদর্য্য মূর্ত্তি দেখে আমার অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। ওঃ, কি অসহায় নিরুপায় আমি! রাস্তার কুকুর বিড়ালের যে আশ্রয় আছে, আমার বুঝি তাও নেই! বাইরের জগতে যে অসংখ্য নরনারী বাসা বেঁধে রয়েছে, জীবনের আনন্দ উপভোগ করছে, তাদের সঙ্গে আমার ত কোনই যোগ নেই, তাদের ওই আনন্দ পুরীতে প্রবেশ করবার অধিকারও নেই!······যে শোক মানুষের কাছে বলবার নয়,

সমস্ত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে যা আচ্ছন্ন করে ফেলে, এই দারিদ্র্যের বিভীষিকার কাছে তাও বুঝি তুচ্ছ! সর্ব্বস্ব গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি, কিন্তু তবু নিজের জন্য এই চিন্তা তো ত্যাগ করতে পারছি না! শুধু প্রাণধারণের জন্য এই উদ্বেগ, এই কি মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় কথা? অতি স্থূল যে দেহের ধর্ম্ম—পশুরও যা আছে, তার থেকে কি মানুষের নিষ্কৃতি নেই?

না, পরাজয় মানব না, এর কাছে কিছুতেই পরাজয় মানব না,—কি শাস্তি আমাকে দিতে পারে সে,—মৃত্যু? তাই বরং বুক পেতে নেব।

আমার এই সঙ্কল্প শুনে বিধাতা বোধহয় অলক্ষ্যে হাসলেন। একটু পরেই মুটের মাথায় অনেক রকম জিনিষ পত্র চাপিয়ে ডাক্তার এসে হাজির।

—এ কি, সেই থেকে এমনি করে বসে আছ বুঝি? কিন্তু এমন ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না, প্রভা,—একটু শক্ত হতে হবে।

ডাক্তারের কাণ্ড দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এমন নির্ল্লজ্জ লোক তো কখনও দেখিনি,—বার বার অপমান হয়েও ওর চেতনা নেই! ইচ্ছা হল খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেই, আর যাতে না আসে। কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করে শান্ত স্বরেই বললাম,

—এসবে তো আমার দরকার নেই ডাক্তার বাবু,—আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

ডাক্তার কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল,—তোমার কথা আমি ভাল বুঝতে পারছি নে, প্রভা,—

অতি দুঃখেও হাসি এল। বললাম,—এর মধ্যে তো না বোঝবার

মত কিছু নেই, ডাক্তার বাবু। আমাকে এসব জিনিষ পত্র দেবার কোন অধিকার আপনার নেই,—আমারও তা নেবার অধিকার নেই। এ তো অতি সোজা কথা।

ডাক্তার একটু চুপকরে থেকে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল,—কিন্তু মানুষের বিপদে মানুষ এটুকু করেই থাকে, অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন এর মধ্যে ওঠে না।

—নিজের মনকে ফাঁকি দেবেন না, ডাক্তার বাবু! আপনি কি চান, কুৎসা আর অপমানের মূল্যে আমি জীবনধারণ করব?

ডাক্তারের মুখ ভূতভয়গ্রস্ত ব্যক্তির মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করে ধীরে ধীরে সে বলল,

—একদিন তোমার বিপদে সামান্য একটু সাহায্য করবার সুযোগ পেয়েছিলাম বলেই আজ এই বন্ধুত্বের দাবী করছি। পথের লোকও তো ডেকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করে, সে টুকুও তুমি আমাকে করতে দেবে না?

দৃঢ়কণ্ঠে বললাম,—না!—

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল,—কিন্তু এই বিশাল নির্জ্জন পুরীতে এমন অসহায় ভাবে কি করে থাকবে তুমি?

একটু ক্রোধের সঙ্গেই বললাম,—সে ভাবনা আপনার নয়,—আমার!

ডাক্তার ভগ্নস্বরে বলল,—বেশ তাই হোক! তবু আমার শেষ অনুরোধ রইল, প্রভা,—যখনই প্রয়োজন হবে, আমাকে ডাকবে, কোন সঙ্কোচ করবে না। তুমি যাই মনে কর, আমি তোমার হিতৈষী বন্ধু।

ডাক্তার চলে গেল। বড় গাছের মাথায় বাজ পড়লে, যেমন

সে মুষড়ে যায়, যাবার সময় ডাক্তারকে দেখেও তেমনি মনে হচ্ছিল।

আমার সমস্ত মন ব্যথায় টন টন করে উঠল, বুক ফেটে কান্না আসতে লাগল। জগতে যে আমার একমাত্র বন্ধু ও হিতৈষী, তাকেই আমি অপমান করে তাড়িয়ে দিলাম। এই নিদারুণ অপমানের পর আর সে কখনও ফিরে আসবে না।··· কি অকৃতজ্ঞ হৃদয়হীন আমি, আমার জন্য যে এত কষ্ট সহ্য করল, আমার দুঃখ লাঘব করবার জন্য যে এমন ব্যাকুল, তাকেই আমি নির্ম্মম ভাবে আঘাত করলাম! নারীর হৃদয় পুরুষের চেয়ে কোমল, এই কথা কে প্রচার করেছিল জানি না,—কিন্তু কথাটা যে সত্য নয়, আমার নিজের মধ্যেই তা অনুভব করছি। নারীর হৃদয় যদি কঠিন হয়ে ওঠে, তবে পুরুষের চেয়ে সে হয় শতগুণে নিষ্ঠুর। লোকে বলে, বাঘের চেয়ে বাঘিনীই বেশী হিংস্র। পৃথিবীতে নারীর নিষ্ঠুরতায় যত সর্ব্বনাশ হয়েছে, এমন বোধ করি, আর কিছুতে নয়।

কিন্তু নিষ্ঠুর না হয়ে তার উপায় নেই যে বন্ধু! ঠুনকো কাচের বাসনের মতই নারীর সুনাম সামান্য আঘাতেই চুরমার হয়ে যায়। সমাজ যে শতচক্ষু মেলে তার দিকে চেয়ে আছে,—দুর্গম পথে কাঁটা-বনের ভিতর দিয়েই তার যাত্রা। সন্দেহের ছায়া সব সময়ই তার অনুসরণ করছে,—কুৎসার মলিন স্পর্শ কখন যে তার দেহে কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দেবে, তার স্থিরতা নাই। মুহূর্ত্তের ভুল হলেও তার ক্ষমা নাই, পিছল পথে পা হড়কে গেলে তার ওঠবার উপায় নাই। তাই তো তাকে নিজের চারদিকে এমন ভাবে গণ্ডী টেনে আত্মরক্ষা

করতে হয়, সহজকেও কঠিন করে তুলতে হয়। যে আঘাত সে দেয়, তার চেয়ে নিজে আঘাত পায় শতগুণ বেশী। ওগো বন্ধু, তুমি তো আমার কাছে কিছুই চাওনি, শুধু সামান্য পরিচয়ের দাবী করেছিলে, সেটুকুও আমি তোমাকে দিতে পারলাম না। এ যে আমার কত বড় দুঃখ, কত বড় বেদনা, তা কি করে বোঝাব!......

কিছুই কি সে চায় নি! তার মনের কোণে একটুও কামনার ছায়া ছিল না? কে জানে, হয়ত আজ যা স্ফুলিঙ্গ, একদিন তাই দাবানলে পরিণত হতে পারত! সামান্য আঘাতের মধ্যে যে পরিচয়ের শেষ হল, তাই হয়ত একদিন দুর্ব্বহ বেদনার সৃষ্টি করত! সমস্ত দিন আমার মনের মধ্যে লড়াই চলল। বুদ্ধি বার বার প্রমাণ করতে চাইল, কাজটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে;—কিন্তু সংস্কার বাধা দিয়ে বলল,—এই ভাল, এই ভাল!

মধ্যাহ্নের সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল। আমি একই ভাবে বসে রইলাম, জলটুকুও মুখে দিতে ইচ্ছা হল না।

*

*   *

—বৌদি—

নারীকণ্ঠের স্বর শুনে চমকে উঠলাম। ফিরে চেয়ে দেখলাম, একটী পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের মেয়ে, বেশ মাজাঘসা চেহারা, জুতামোজা পায়ে, বেশ ভূষায় পারিপাট্য আছে। চিনতে না পেরে, বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলাম।

সে বলল,—চিনতে পারছেন না? আমি গিরিবালা। আপনি যখন নূতন বৌ হয়ে এলেন,—আমিই আপনার খাস ঝি ছিলাম।

অতীতের কুয়াশা ভেদ করে, এতক্ষণে গিরির চেহারা চোখের উপর ভেসে উঠল। ভদ্রবংশের মেয়ে—আমার শ্বশুরকুলেরই দূর কুটুম্ব, বালবিধবা হয়ে এই বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। আমার পরিচর্য্যা করা ছাড়া, বিশেষ কিছু তাকে করতে হত না,—সকলের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা গল্প করেই তার সময় কাটত। সে যে বালবিধবা, এ বোধ তার একেবারেই ছিল না। বয়স তখন তার পনের-ষোল বছরের বেশী নয়। নববসন্তে পুষ্পিতা লতার মতই ছিল তার রূপ; দীঘির কালো

বালির বাঁধ

জলের মত তার কালো চোখের গভীর দৃষ্টি, নৃত্যচপল গিরিনদীর কলগানের মতই ছিল তার হাসি।

কিন্তু সেই রূপই হল তার কাল। একদিন হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ হল। অনেক চেষ্টা করেও তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তার পর থেকে এ বাড়ীতে আর কেউ গিরির নামও উচ্চারণ করত না। কেবল আমি কয়েক বছর পর্য্যন্ত তার কথা ভুলতে পারি নি।...

সেই গিরি আজ একযুগ পরে নূতন মূর্ত্তিতে এসে উপস্থিত!

মনে একটু আনন্দ—সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বিস্ময়ও হল। মাথা নেড়ে জানালাম,—আমি তাকে চিনেছি।

গিরি বলল,—তুমি তো সবই জান, বৌদি, এ বাড়ীতে আমার আর মুখ দেখাবার জো ছিল না। কর্ত্তা বাবু, গিন্নীমা গেছেন, সংসারে ভাঙ্গন ধরেছে,—দূর থেকে শুনেছি, আসতে সাহস পাই নি। কিন্তু আজ এই নিদারুণ খবর শুনে আর স্থির থাকতে পারলাম না। এসে যে এমন দশা দেখব, স্বপ্নেও ভাবিনি, সোনার পুরী শ্মশান হয়েছে, ইন্দ্রানী আজ তপস্বিনীর বেশে—

গিরির চোখে জল দেখে আমি আর আত্মসংবরণ করতে পারলাম না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

গিরি অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলল,—দাদাবাবুর যে এমন কালব্যাধি হয়েছিল, তা আমি কিছুই জানতে পারিনি—নইলে আমি ছুটে আসতাম।

ভাবলাম, সব মানুষই তা হলে পাষাণ নয়,—এ অরণ্যে কেবল সাপ বাঘ ভালুকই বাস করে না, মানুষও আছে।

বালির বাঁধ

গিরি চোখের জল মুছতে মুছতে বলল,—কিন্তু তুমি যে এমন করে আত্মহত্যা করবে, বৌদি,—তা কিছুতেই হতে দেব না। ওঠ, স্নান করে নাও, আমি সব জোগাড় করে দিচ্ছি—

—না, গিরি, আমি আর অন্নজল মুখে দেব না, বেঁচে থাকতে আমি চাই নে—

—তুমি তো অবুঝ নও বৌদি,—জন্মমৃত্যু ভগবানের হাতে—

—কিন্তু ভগবান তো আমার বেঁচে থাকবার কোন আশ্রয়ই রাখেন নি,—আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকব?—

গিরি একটা মর্ম্মভেদী নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বলল,—সবই বুঝি বৌদি,—রাজরাণী হয়েও তুমি আজ ভিখারিণী, তোমার দুঃখের সীমা নাই! কিন্তু তবু বেঁচে থাকতে হবে, দুঃখকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় পালাবে বৌদি?

একটু থেমে আবার বলল,—আমি যে এত বড পাপী, হতভাগী, আমিও মরতে পারি নি,—যদিও এমন একদিন এসেছিল, যেদিন মৃত্যুই ছিল আমার লজ্জা রাখবার একমাত্র উপায়! যার হাত ধরে সর্ব্বনাশের পথে পা বাড়িয়েছিলাম, সে যখন সমস্ত কলঙ্কের বোঝা আমারই মাথায় চাপিয়ে দিয়ে, ভাঙ্গা মাটীর ভাঁড়ের মত পদাঘাত করে পথের ধারে ফেলে চলে গেল,—সেদিন কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ডেকে বলেছিলাম, হে ভগবান, মৃত্যু দাও—আর যে সহ্য করতে পারি নে!

কিন্তু ভগবান আমার সে প্রার্থনা শোনেন নি।—কদিন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম বলতে পারি নে, জ্ঞান হয়ে দেখলাম, হাসপাতালে পড়ে আছি। নার্সের মুখে শুনলাম, পেট কেটে মরা ছেলে প্রসব করাতে

হয়েছে। প্রতি মুহূর্ত্তে তারা আমার মৃত্যুর আশঙ্কা করছিল, কিন্তু এমনই কঠিন প্রাণ, সকলকে আশ্চর্য্য করে দিয়ে বেঁচে উঠলাম। কেঁদে বললাম,—কেন তোমরা আমাকে বাঁচালে? আমাকে গলা টিপে মেরে ফেল, কোন পাপ হবে না তোমাদের! মৃত্যুর চেয়ে জীবনই যে আমার পক্ষে ভয়ঙ্কর!

কি জানি কেন, বুড়ো নার্সের মায়া হল,—বললেন,—ভয় কি, আজ থেকে তুমি মেয়ের মত আমার কাছেই থাকবে। সত্য যতই ভীষণ হোক, তার মুখোমুখী যে সাহস করে দাঁড়ায়, জগতে তার ভয় কিসের? নদীর ঢেউয়ের মতো কলঙ্ক তার চরণ স্পর্শ করে যায়, তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

এমনি করেই আশ্রয় পেলাম। এই কলঙ্কিত জীবনেরও যে একটা মূল্য আছে, তা বুঝতে পারলাম। কলঙ্কিনী গিরিবালা অনেকদিন মরে গেছে, কিন্তু তার চিতাভস্ম থেকে নার্স গিরিবালার জন্ম হয়েছে, সে কাউকে ভয় করে না!—

আমি অবাক হয়ে গিরিবালার কথা শুনছিলাম। তার উপর আমার সত্যিকার শ্রদ্ধা জেগে উঠল। এই সেই বিপথগামিনী নারী,—আজ তার কি অকুণ্ঠ নির্ভীক মূর্ত্তি! একদিন মুহূর্ত্তের ভুলে তার মতিচ্ছন্ন ঘটেছিল, সর্ব্বনাশের পথে সে পা দিয়েছিল বটে,—কিন্তু সেই তার জীবনের শেষ কথা নয়।

সহসা আমার মনে হল, তাইতো, এ জীবনকে নষ্ট করবার অধিকার আমারও নাই! জীবনে যে দুঃখকে দেখে আমি ভয় করছি, মৃত্যুর অজ্ঞাত অন্ধকার রাজ্যে তা যে শতগুণ ভীষণ হয়ে উঠবে না, কে

জানে ?······দারিদ্র্য, অনাহার, নিরাশ্রয়ের বিভীসিকা ? এই অসহায়া নারী, এ যদি নিজের পায়ে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, আমিই বা পারব না কেন ? লজ্জা সঙ্কোচ সম্ভ্রম,—আভিজাত্যের গৌরব, এসব তো মনের ভ্রম, মিথ্যা মায়া, এরা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে—অসম্মানের পথেই আরও ঠেলে দেয়! বাঁচতেই যদি হয়, তবে কারু দয়ায় বা অনুগ্রহে নয়,—নিজের শক্তিতেই বাঁচতে হবে।

বললাম,—এ বিপদে তুমিই আমাকে পথ দেখিয়ে দিলে গিরি,—তোমার ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারব না—

গিরি জিভ কেটে বলল,—সে কি কথা বৌদি, আমি তো তোমাদের খেয়েই মানুষ। যেদিন আমাকে সবাই ত্যাগ করেছিল, আপনার বলতে কেউ ছিল না, সে দিন তোমরাই তো আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে।—ওসব কথা বলে আমাকে আর লজ্জা দিও না।

গিরি সমস্ত দিন থাকল। সন্ধ্যার পর সে বলল,—বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসি বৌদি, রাত্রে এখানেই থাকব—

—না গিরি, তাতে তোমার কষ্ট হবে, কাজেরও ক্ষতি হবে।

গিরি হেসে বলল—কোন ক্ষতি হবে না বৌদি। তুমি যে এই নির্জ্জন পুরীতে একা রাত কাটাবে, সে কিছুতেই হতে পারে না। জান তো, মানুষকে বিশ্বাস নেই, অবস্থা বিশেষে তারা হিংস্র জানোয়ার!

তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। এই সমাজ-পরিত্যক্তা নারী, এত বড় প্রাণ, ও কোথায় পেল ?

সমস্ত রাত গিরির জীবনের কাহিনীই ভাবলাম। পরদিন তাকে

বললাম,—আমাকেও কোন হাসপাতালে নার্সের কাজে ভর্ত্তি করে দাও গিরি!

গিরি কিছুক্ষণ বিস্ময়ভরে আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল,—সে কি বৌদি, তুমি যাবে হাঁসপাতালে নার্সের কাজ করতে?—

তার চোখ ছল ছল করতে লাগল।

বললাম,—দোষ কি গিরি? রোগীর সেবা করাটা তো খারাপ কাজ নয়,—ভিক্ষা করার চেয়ে সে যে ঢের বেশী সম্মানের কাজ!

গিরি কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে বলল,—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

*

* *

আমার জীবননাট্যে পট পরিবর্ত্তন হল, নূতন ভূমিকা নিয়ে আমি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলাম। একমাস পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবি নি, বনিয়াদী মিত্রবংশের কুলবধূ আমি,—হাসপাতালে নার্সের কাজ নেব। আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী যদি পরলোক থেকে এ দৃশ্য দেখতেন, তবে তাঁরা কি করতেন, আমি ভাবতে সাহস পেলাম না।

কিন্তু মানুষ নিজেই জানে না, তার জীবনে পরমুহূর্ত্তে কি ঘটবে, সে যেন স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে, নিজের উপর তার কোন জোর নেই।

যে দিন প্রথম হাসপাতালে গেলাম, সে দিনের কথা আজও আমার স্পষ্টই মনে আছে। গিরি ভয়ে ভয়ে বলল,—কিছু যদি মনে না কর, বৌদি, একটা কথা বলি। নূতন জায়গায় প্রথম দিনটা কাজে ভর্ত্তি হতে যাবে, কাপড় চোপড় একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার—যেখানকার যা নিয়ম তাতো মানতে হবে—

গিরির কথায় আপত্তি করতে পারলাম না, নইলে আমার অন্তরে যে দাবানল জ্বলছিল, বেশভূষার আবরণে তা ঢেকে রাখব, এ চিন্তাও আমার কাছে অসহ্য।

বালির বাঁধ

কাপড় চোপড় পরে একবার আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।···এই বড় আয়নাটা শ্বশুর সাধ করে কিনে দিয়েছিলেন, তাঁর বৌ-রাণীর প্রসাধন করবার জন্য। কতদিন কতকাল—এই আয়নার সামনে দাঁড়াই নি, নিজের চেহারা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলাম।······ আয়নার দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলাম। চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত, এ কার ছবি ফুটে উঠেছে—এ কি আমি—আমি ? এই তরুণী নারীমূর্ত্তি—অঙ্গে অঙ্গে যার লাবণ্যের তরঙ্গ, অবয়বের রেখায় রেখায় বর্ণে বর্ণে যার সুষমার সমাবেশ ;—শুভ্র বিধবার বেশ, কোন প্রসাধন নেই, অলঙ্কার নেই,—তবু যার ভিতর দিয়ে রূপ যেন শতধারায় ফেটে পড়ছে—একি আমি ! নিষ্ঠুর বিধাতা একি তোমার নির্ম্মম অত্যাচার ? এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত অগ্নিপরীক্ষাতেও এই তুচ্ছ রূপ পুড়ে ছাই হয়ে যায় নি, নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায় নি ! এই সর্ব্বনাশা রূপ নিয়ে আমি কোথায় যাব ? দরিদ্র বিধবার, হাসপাতালের একটা সামান্য নার্সের এত রূপ—এযে মোটেই সইবে না !···

—গিরি, এ কাজ আমি নিতে পারব না, আমি যাব না—!

গিরি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল,—কেন বৌদি, কি হল তোমার আবার ?

গিরির কাছে মুখ ফুটে কথাটা বলতে কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। কিন্তু না বললেও তো নয়। অনেক ইতস্ততঃ করে অবশেষে বললাম,—গিরি, আমার সর্ব্বাঙ্গে ছাই মাখিয়ে দিতে পার—সন্ন্যাসিনীদের মত ?

গিরি এতক্ষণে আমার মনের ভাবটা অনুমান করল। মৃদু হেসে

বলল,—বড় দুঃখেও তুমি হাসালে, বৌদি, ছাই দিয়ে কি আগুন চাপা যায় ?

—তবে কি হবে—?

—কিছুই হবে না ! তুমি মিথ্যা ভয় করছ,—আগুনে হাত দেবার দুর্ব্বুদ্ধি যার হবে, সেই পুড়ে মরবে ! এখন চল, ঠিক সময়ে পৌঁছানো চাই !...

প্রকাণ্ড হাসপাতাল। ডাক্তার, নার্স, ছাত্রেরা, ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সর্ব্বত্র একটা উৎসাহ জীবনের লক্ষণ,—কিন্তু সব শান্ত, নিস্তব্ধ, কোথাও সূচীপতনের শব্দটুকু পর্য্যন্ত যেন নাই। অন্তঃপুর-চারিণী নারী আমি, কোন দিন এমন দৃশ্য দেখিনি। আমার মনে একটা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব জাগল। ছেলেবেলা থেকে হাসপাতালের নামে কেমন আতঙ্ক হত,—ভাবতাম, সেখানে যে যায়, সে আর ফিরে আসে না, ও যেন যমপুরীর একটা বড় দরজা। কিন্তু আজ আমার সেই ভুল ভেঙ্গে গেল। মনে হল, এমন আরামের জায়গা আর কোথাও বুঝি নাই !

গিরির সঙ্গে প্রকাণ্ড হল পার হয়ে ছোট একটা ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। একজন প্রবীণা মেম-সাহেব টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কি সব খাতাপত্র দেখছিলেন। আমাদের পায়ের শব্দে মাথা তুলতেই গিরির দিকে তাঁর চোখ পড়ল। মৃদু হেসে বললেন,—

—এই যে মিস্ দত্ত ! এইটী তোমার সেই বন্ধু বুঝি ?

বলেই আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, তাঁর চোখে মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল।

গিরি বলল,—হঁ্যা, ইনিই মিসেস্ মিত্র, খুব বড় ঘরের বৌ, কিন্তু—

মেম সাহেব একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—ওঁকে দেখেই তা বুঝেছি। কিন্তু ওঁর মত বড় ঘরের মেয়েরা খুব কমই এখানে আসেন। তাই আমার আশঙ্কা হয়, উনি বেশীদিন এ কাজ করতে পারবেন না!

গিরি বলল,—একদিন বড়ঘরের বৌ ছিলেন বলে, চিরদিনই তার শাস্তি ওঁকে ভুগতে হবে, আপনি কি এই বলতে চান, ম্যাডাম? আজ আপনি যদি আশ্রয় না দেন, তবে ওঁকে হয়ত পথে দাঁড়াতে হবে।

আমিও সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ জোর করে কাটিয়ে বললাম,—অতীতে কবে কি ছিলাম, সেই মিথ্যা অভিমান আমি ভুলতে চাই। আমি অসহায়, দরিদ্র বিধবা, আরও দশজনের মত খেটে খেতেই চাই।

মেমসাহেব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন,—তুমি তো জান, মিস্ দত্ত, ওঁর মত মেয়ের পক্ষে হাসপাতাল কি বিপদের জায়গা!

গিরি একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে উত্তর দিল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ম্যাডাম,—আমি ওঁর সব ভার নিলাম, আমাকে তো আপনি জানেন—

—বেশ তাই হবে, এখন তিন মাসের জন্য উনি তোমার সঙ্গেই কাজ করবেন, তার পর—

আমার দিকে চেয়ে—কোমল স্বরে বললেন,—আপনার এতে কোন আপত্তি নেই তো মিসেস মিত্র?

তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললাম,—আপনার ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না।

হলের ভিতর আসতেই পাঁচ সাতটী বাঙ্গালী মেয়ে আমাদের ঘিরে

ধরল। এরা সকলেই নার্স। একজন আমার দু'হাত ধরে সোল্লাসে বলল,—আপনাকে পেয়ে আমরা খুব আনন্দিত, আজ থেকে আপনি আমাদেরই একজন। কি বলে ডাকব ?

গিরি উত্তর দিল,—মিসেস্ মিত্র। আর একটী মেয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, উঁহু—ও নাম মঞ্জুর নয়, ওটা পোষাকী নাম, আসল নামটা কি বলুন—

মৃদুস্বরে বললাম,—প্রভা,—

মেয়েটী আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল,—ঠিক ঠিক, প্রভা-দি—

সকলে উচ্চহাস্য করে উঠল।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, এদের মনে বুঝি দুঃখের লেশমাত্র নেই, সব সময়ে আনন্দে ভরপুর। জীবনের একটা নূতন রূপ এরা দেখতে পেয়েছে।...যদি এদের মত হতে পারতাম!

একটী আঠার উনিশ বছরের মেয়ে, সে যেন আনন্দের উৎস, মুখে সব সময় হাসি লেগেই আছে। হাসতে হাসতে সে বলল,—আমাদের তরু-দিই ছিল সব চেয়ে সুন্দরী। কিন্তু তোমার কাছে সেও দাঁড়াতে পারে না প্রভা-দি, তুমি সাক্ষাৎ ইন্দ্রানী!

তরু গম্ভীর ভাবে বলল,—এখানে তো আর উনি 'বিউটী কম্‌পিটিশান' করতে আসেন নি যে, রূপের হিসাব নিকাশ করতে হবে। অমিতা যেন কি!

—অমনি তরুদির 'জেলাসি' হল!—বলে অমিতা আরো হাসতে লাগল।

গিরি একটু ভারিক্কী চালে বলল,—এই তুচ্ছ কথা নিয়ে অমনি

তোমাদের খিটিমিটি বেধে গেল! প্রথম দিনই ওঁর সামনে নিজেদের আসল পরিচয় দেওয়া ঠিক নয়।

আমি অমিতার হাত ধরে হেসে বললাম,—না না, আমি কিছু মনে করি নি। আমাকে কিছু মাত্র সমীহ করে চলতে হবে না। যদি কর, সেই হবে আমার সব চেয়ে কঠিন শাস্তি।

অমিতার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলাম, তরুর মুখের আঁধার দূর হল না।

হল ছেড়ে বারান্দায় আসতেই চোখে পড়ল, একজন সাহেবী পোষাকপরা ভদ্রলোক, একটা গোল টেবিলের সামনে বসে আছেন, তাঁর আসে পাশে চার পাঁচ জন যুবক দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখেই তারা সচকিত হয়ে উঠল, সকলেরই বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি আমারই উপর নিবদ্ধ হল।

গিরি সাহেবী পোষাকপরা ভদ্রলোকটীকে বলল,—ডাঃ চ্যাটার্জ্জি, ইনি নূতন নার্স মিসেস্ মিত্র, আমার সঙ্গে কাজ করবেন।

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়েছিলেন, সে দৃষ্টি যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করছিল,—এমন ভাবে কেউ কোন দিন তো আমার দিকে চায় নি! গিরির কথা শুনে একটু থতমত খেয়ে বললেন,—

—ভারী খুসী হলাম—আমার ওয়ার্ডে ওঁর মত একজন নার্সকে পেয়ে,—It is really an acquisition.—

তার পর একটু থেমে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন,—মিস্ দত্ত তুমি ওঁর স্পেশাল চার্জ্জ নেবে। ওঁর মত ভদ্রঘরের মেয়েরা যদি

নার্সের কাজে যোগ দেন, তবে হাসপাতালের চেহারাই ফিরে যাবে। বিলাতে কত বড় বড় লর্ডের মেয়েরা পর্য্যন্ত নার্সের কাজ করতে গৌরব বোধ করেন। আমাদের দেশে সে ভাব আনতে এখনও অনেক দেরী—

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী আবার সেই ক্ষুধিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। সে দৃষ্টির সামনে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে আমার যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। ডাক্তার সাহেবের আশেপাশে যে সব যুবক দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের চোখও যে, এক মুহূর্ত্তও আমার উপর থেকে সরে যায় নি, এ আমি বেশ অনুভব করতে পারছিলাম।

বাড়ী ফিরবার সময় কেবলই মনে হচ্ছিল, ভগবান এ রূপ আমি কোথায় লুকাব? নারী মাত্রেই যে রূপের জন্য কামনা করে, তাই যে আজ আমার কাল হয়ে উঠল। গিরি আমার মনের ভাব কতকটা বুঝতে পেরেছিল। সান্ত্বনার স্বরে সে বলল,—প্রথমটা একটু বেগ পেতে হবে বৌ-দি, কিন্তু ক্রমে সব ভয় সঙ্কোচ কেটে যাবে—এও যে এক তপস্যা!

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বললাম,—তপস্যাই বটে!

*

*   *

পর দিন থেকে আমার সেই কঠিন তপস্যা সুরু হল। চিরকাল যে ছিল অন্তঃপুরে বন্দিনী, সহসা লোকারণ্যের মধ্যে মুক্তি পেয়ে, নিজেকে নিয়ে সে বিব্রত হয়ে পড়ল। সহস্র চক্ষুর ক্ষুধিত দৃষ্টির সামনে আমার সমস্ত অন্তর বাণবিদ্ধ হরিণীর মতই ছটফট করত। নারীর দেহ কি পুরুষের কাছে কেবলই কামনার বস্তু, কলুষিত দৃষ্টি ছাড়া আর কোন চোখে সে কি তাকে দেখতে পারে না? জননী কন্যা ভগিনী বন্ধু—পুরুষের কাছে নারীর কি আর কোন বড় পরিচয় নেই,—আছে কেবল সেই আদিম নর নারীর পঙ্কিল সম্বন্ধ? পুরুষের কণ্ঠে নারীর এই যে স্তুতি, কাব্য কাহিনী রূপকথায় এই যে ফেনিল উচ্ছ্বাস, এর মূলে কি সেই একই পঙ্কিল ভাবের প্রেরণা?

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী আমাকে নিয়ে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমার যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সে দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। তাঁর খাস ওয়ার্ডে আমার কাজের ব্যবস্থা হল,—সকলকে বলে দিলেন,—নূতন মানুষ, ও যেন কোন ঝঞ্ঝাটে পড়তে না হয়। দিনে দশবার নিজে এসে আমার খোঁজ নিতে লাগলেন। তাঁর যে সব

যুবক সহকারীর দল, তাদের তো কথাই নেই, আমার সেবা করাই যেন তাদের একটা মস্ত কাজ হয়ে উঠল। মনের কথা খুলে প্রকাশ করতে না করতে তারা ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসত।

কিন্তু আমার মন তাতে কিছুতেই সাড়া দিত না,—বিদ্রোহীর মত মাথা নাড়া দিয়ে বলত,—এসব আমি চাইনে, নারীর প্রতি এই সম্মান, এ যে মুখোসপরা ভণ্ডামী, আত্মপ্রতারণা!

ব্যাপার দেখে অন্য নার্সেরা মুখ টিপে হাসত, তাদের ইসারায় ইঙ্গিতে রঙ্গরহস্যের বান ডাকত।

তরু একদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই করুণাকে বলল,—রাজ-রাণীকেও লোকে এমন তোয়াজ করে না, ডাক্তার চ্যাটার্জ্জীর যেন চোখের পর্দ্দা নেই! ছোঁড়া ডাক্তারগুলোই বা কি রকম! কোন দিন যেন কটা চামড়া আর ড্যাবডেবে চোখ দেখে নি—

করুণার মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল, রসিয়ে রসিয়ে সে বলল, —রাজরাণীর চেয়েও বড় সম্পত্তি যে ওর আছে, ওতেই তো পুরুষগুলোর মুণ্ডু ঘুরে যায়!

করুণা কালো মোটা বেঁটে,—বিধাতা যেন ইচ্ছা করেই সমস্ত সৌন্দর্য্য থেকে তাকে বঞ্চিত করেছেন।

তরু খিল খিল করে হেসে উঠল, সে তো হাসি নয় শাণিত ছুরিকা!

অমিতা সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল, একবার চেয়েই ব্যাপারটা চট করে বুঝে নিল। থমকে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল,—তরু-দির ভাগীদার জুটে যাবে বলে ভয় হয়েছে বুঝি! কিন্তু ভয় নেই, একজনের কাছে যা অমৃত, আর একজন তাকেই বিষ বলে মনে করে।

আমার চোখ ফেটে জল বের হল। অমিতা আমার কাছে এসে বলল,—ওকি, প্রভা-দি, অত নরম হলে তো চলবে না,—এ নরম হবার জায়গা নয়, তা হলে তোমাকে সবাই জোঁকের মত ছেঁকে ধরবে!

তরু গর্জ্জন করে বলল,—তোর বড় বেশী বাড় হয়েছে অমিতা! ডাঃ চ্যাটার্জ্জীকে বলে—

—আমাকে শাস্তি দেওয়াবে! তা করো। আমার কোন তালুক-মুলুক নেই যে ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী কেড়ে নেবেন। চল প্রভা-দি, আমরা এখান থেকে যাই—

তরু নিষ্ফল আক্রোশে কুপিতা ফণিনীর মত ফুলতে লাগল।

এমনি করে কয়দিন কেটে গেল, আমিও প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে, মনকে কঠিন বর্ম্মে বাঁধতে চেষ্টা করলাম। ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর উৎসাহের মাত্রা কিন্তু ক্রমেই বাড়তে লাগল। তাঁর ভাবটা এমন হয়ে দাঁড়াল, যেন হাসপাতালে আমি ছাড়া আর কোন নার্সই নাই!

ছোকরা ডাক্তারেরা তো আমার একটা কথা শোনবার জন্য, একটু হাসি দেখবার জন্য কি যে করত, তা মনে করলে এখন হাসি পায়। আমার মন ধৈর্য্যের বাঁধ যেন আর মানতে চাইত না, কঠিন বর্ম্ম ভেদ করে বিদ্রোহী হয়ে উঠত। গিরি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলত,—বৌদি, আর কটা দিন সবুর কর, সব ঠিক হয়ে যাবে। ওদের রকম দেখে আমার তো রাগ হয় না, বরং হাসিই পায়!

গিরি বুঝত না, অনেক পোড় খেয়ে তার মন আজ এমন কঠিন হয়ে উঠেছে,—আর আমার অগ্নি পরীক্ষা সবে সুরু হয়েছে!

কয়েকদিন পরে মেয়ে ওয়ার্ডে একটী রোগিণীর সেবার ভার আমার উপরে পড়ল। তাকে প্রথম দিন দেখেই আমার বড় মায়া হল। বয়স উনিশ কুড়ি বছরের বেশী হবে না, কিন্তু এই বয়সেই কোন লাবণ্য তার দেহে নেই। জীর্ণ কঙ্কালসার মূর্ত্তি, রঙ এককালে হয়ত ফর্সা ছিল, কিন্তু এখন পাণ্ডুর বর্ণের ছোপ কে যেন তার সারা দেহে লাগিয়ে দিয়েছে। কত অনাহার, কত অত্যাচার নির্য্যাতনের ঝড় যে ওর দেহের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, তা কে বলতে পারে? কিশোর বয়সে ওর চোখ দুটীতে আকাশের নীলিমা, সাগরের অতলস্পর্শ গভীরতা হয়ত ছিল,—কিন্তু এখন তা চিরন্তন বেদনার প্রতীক! ললাটের রেখায়, পাতলা ঠোঁটের ভঙ্গীতে, সুকুমার চিবুকের সুষমায়—এখনও আভিজাত্যের চিহ্ন সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি,—ছাইচাপা আগুণের মত বুঝি ধিকি ধিকি জ্বলছে।

শুনলাম, পথের ধারে কোথায় এক গাছতলায় ও পড়েছিল, সেবাসমিতির লোকেরা এখানে রেখে গিয়েছে।

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী রোগীকে দেখে প্রথমেই মুখ বেঁকিয়ে বললেন,—যত সব ঘাটের মড়া এখানে এনে জড়ো করবে, লোকেরও খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই! এর চিকিৎসা করা মানে নিজের দুর্ণাম ডেকে আনা—

ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে এ পর্য্যন্ত একটী কথাও আমি বলিনি, মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলাম, বলবও না। কিন্তু আজ এই অভাগিনীর জন্ত আমার সে সঙ্কল্প ভাঙ্গতে হল। বললাম,

—দেখুন, আমার মনে হয়, চেষ্টা করলে এখনো ও বাঁচতে পারে।

বালির বাঁধ

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী আমার কণ্ঠস্বর শুনে যেন চমকে উঠলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, তাঁর চোখে মুখে একটা চাপা উল্লাসের ভাব ফুটে উঠল। তারপর বললেন,

—বেশ, তুমি যখন বলছ, তখন শেষ পর্য্যন্ত আমি চেষ্টা করব, কিন্তু তোমাকেই ওর শুশ্রূষার ভার নিতে হবে, বড় কঠিন কাজ!

আমি অগত্যা সম্মত হলাম,—কিন্তু একটা অজ্ঞাত হস্তের তুষার-শীতল স্পর্শে যেন আমার সমস্ত শরীর ক্ষণকালের জন্য হিম হয়ে গেল।

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী চলে যেতেই রোগিণী ক্ষীণ কণ্ঠে বলল,

—আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবেন না, আমি বাঁচতে চাই নে—

আমি তার শীর্ণ হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম,—কেন বাঁচতে চাও না বোন, কি তোমার এত দুঃখ? তুমি কি জান না, স্বেচ্ছায় জীবনকে নষ্ট করা মহাপাপ, সে অধিকার কারু নেই!

রোগিণীর অধরে করুণ হাসির রেখা ফুটে উঠল,—সে হাসি ঘনীভূত বেদনারই রূপান্তর। বলল,—জীবনের দ্বার আমার কাছে রুদ্ধ, অথচ মরবার স্বাধীনতাও আমার নেই,—উঃ, মানুষ কি নিষ্ঠুর!

আমি ধীরে ধীরে তার বিশৃঙ্খল কেশপাশ সুবিন্যস্ত করতে করতে বললাম,—তোমার বয়স তো বেশী নয়,—এ বয়সে তোমার এমন দশা কেন হল? আমাকে সব কথা খুলে বলবে না বোন?

তার দু'চোখের প্রান্ত বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। কোন কথা না বলে সে শুধু ললাটে করাঘাত করল।

অদৃষ্ট—অদৃষ্ট! এই অদৃষ্টই এদেশের মেয়েদের সমস্ত শক্তি হরণ করেছে। কি ভয়ঙ্কর সম্মোহিনী অস্ত্র!

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বললাম,—তোমার কে আছে, কারু সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা হয়,—কাউকে খবর দেব ?

কয়েক মুহূর্ত্ত উদাসভাবে চেয়ে থেকে রোগিণী বলল,—একদিন সবই আমার ছিল, কিন্তু এখন আমি সর্ব্বহারা, পথের ভিখারিণীর চেয়েও অধম—

এতক্ষণে আমি ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম, তার সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ তখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। একহাতে আয়তির চিহ্ন লোহার কাঁকণ, অতীত সৌভাগ্যের ধ্বংসাবশেষরূপে বিদ্যমান। হায়, অভাগিনী, তোমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অন্তরালে কি বিরাট বেদনার ইতিহাসই না লুকিয়ে আছে!

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী কতকগুলো ওষুধপত্র নিয়ে প্রবেশ করলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন,—নিজেই ওষুধ তৈরী করে নিয়ে এলাম, আর কারু উপর ভার দিয়ে বিশ্বাস হল না। খুব সাবধানে রাখতে হবে। ওর জীবনীশক্তি এত কম যে, এক মুহূর্ত্তে বিপদ ঘটতে পারে।

তারপর চেয়ারখানা আমার দিকে একটু টেনে নিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললেন,—তোমার রোগী বলেই এতটা যত্ন নিচ্ছি—

সে হাসি, সে দৃষ্টি আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন কষাঘাত করল। আমি কোন উত্তর না দিয়ে নতমুখে বসে রইলাম।

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী আরও খানিকটা বসে থেকে উঠলেন, বলে গেলেন, দুঘণ্টা পর আবার এসে দেখে যাবেন।

সন্ধ্যার সময় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই এমন একটা দৃশ্য চোখে পড়ল যে আমার শরীর শিউরে উঠল। সেই বিমান

ডাক্তার সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে! সম্মুখে কালসাপ দেখলেও লোকে বোধ হয় এত ভীত হয় না! পলায়ন করেও কি ওর হাত থেকে আমার নিস্তার নেই—নির্ম্মম নিয়তির মত ও আমার অনুসরণ করবে?

বিমান অমায়িক ভাবে হেসে নমস্কার করে বলল,—এই যে প্রভা, তোমার সঙ্গে যে আবার দেখা হবে, সে আশা করি নি।

আমি নির্ব্বাক স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম, তারপর রুদ্ধকণ্ঠে বললাম.—আপনি এখানে—

বিমান ম্লান হেসে বলল,—এখানে আমি অনারারী সার্জ্জনের কাজ করি।

তবে কি আমার জন্যই ও এখানে কাজ নিয়েছে? একটা প্রচণ্ড অভিশাপের মত ও চিরদিন আমার জীবন আচ্ছন্ন করে থাকবে?

বিমান পুনরায় বলল,—তোমার কথা আমি ভুলতে পারি নি, প্রভা, কিন্তু তোমাকে শেষকালে নার্স হতে হল?

তার স্বরে একটা গভীর বিষাদের সুর!

তীব্র কণ্ঠে বললাম,—আমাকে এমন করে অপমান করবার অধিকার আপনার নেই, ডাঃ বোস। আমার সঙ্গে যে কোন কালে আপনার পরিচয় ছিল, এ কথা ভুলে যান। নইলে আপনার জন্যই হয়ত এ হাসপাতাল আমাকে ছাড়তে হবে!

বিমানের মুখ বেদনায় কালো হয়ে গেল। আমি কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে দ্রুতপদে বাড়ী ফিরে এলাম।

সমস্ত রাত্রি ভাল করে আমার ঘুম হল না, বিমানের সেই বেদনাহত মুখ আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল। এ কি নিষ্ঠুর নিয়তি!

বালির বাঁধ

যাকে আমি এড়িয়ে চলতে চাই, আমার জীবনপথে বার বার ধূমকেতুর মত তারই ছায়া পড়ে কেন? যার কাছে আমার ঋণের শেষ নাই,—কৃতঘ্নের মত বার বার তাকেই এমন ভাবে আঘাত করতে হয় কেন?···কিন্তু আঘাত করবার ইচ্ছাটা আমারই দুর্ব্বলতার লক্ষণ! নিজের মনে সংশয় আছে বলেই তো অকারণ আঘাত দিয়ে সেই দৌর্ব্বল্যকে ঢাকতে চাই। একথা মনে হতেই একটা দারুণ লজ্জা আমার অন্তরকে যেন অবশ করে ফেলল।

পরদিন হাসপাতালে যেতেই দেখি বিমান সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে সে নমস্কার করল, কিন্তু কোন কথা বলল না। আমিই জোর করে সঙ্কোচ কাটিয়ে ধীরে ধীরে বললাম,

—ডাঃ বোস, কাল যে আপনাকে রূঢ় কথা বলেছি, সেজন্য ক্ষমা চাইছি—

বিমান ম্লান হেসে বলল,—আপনার তো ক্ষমা চাইবার কথা নয়, মিসেস্ মিত্র,—আমারই বরং ক্ষমা চাওয়া উচিত—

আমি বিস্মিত ভাবে বিমানের দিকে চাইলাম,—'মিসেস্ মিত্র' এই অপরিচিতের সম্বোধন আমার অন্তরের কোন বেদনার তারে গিয়ে আঘাত করল।···কিন্তু ওতো কোন অন্যায় করেনি,—আমি নিজেই যে ওর সঙ্গে পরিচয়ের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলতে চেয়েছি! তবু—তবু কেন আমার এই দৈন্য, অন্তরের এই প্রচ্ছন্ন অভিমান?

আমি আর কোন কথা না বলে দ্রুতপদে হলের ভিতর প্রবেশ করলাম।

রোগিণীর অবস্থা আজ বড় খারাপ। সে প্রলাপ বকতে আরম্ভ

করেছে।…"ওগো তোমার দুই পায়ে পড়ি, আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও দাও, কিন্তু এই নির্দোষ শিশুর উপর দয়া কর। ও যে দেবতার পূজার ফুল!" ..

একি শুধুই অর্থহীন অসংলগ্ন প্রলাপ? না, ওর মনের তলে যে-বেদনার ফল্গুনদী বয়ে যাচ্ছে, তারই ক্ষণপ্রকাশ? আমি ওর শয্যার পাশে বসে মাথাটা কোলে তুলে নিলাম। সদ্যস্নান করে এসেছিলাম, তাড়াতাড়িতে চুল বাঁধবার সময় পাই নি,—একরাশ চুল এলোমেলো ভাবে আমার পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল।

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী এলেন। আমার দিকে মুগ্ধনেত্রে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন,—তোমাকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছে, প্রভা! মনে হচ্ছে, ঠিক যেন কোন এঞ্জেল, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছ,—এই হতভাগিনীর দুঃখ লাঘব করবার জন্য—

কাছেই একটা চেয়ারে বসে পড়ে পুনরায় বললেন,—এমন এঞ্জেলের কোলে মাথারেখে মরাও একটা সৌভাগ্য। ওর উপর বাস্তবিকই আমার হিংসা হচ্ছে!

লজ্জায় অপমানে আমার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে আমি ধীরে ধীরে বললাম,

—আপনার মুখ থেকে এমন কথা শুনতে হবে ভাবিনি—

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী অমায়িক ভাবে হেসে বললেন,—এ আর ভাববার কথা কি? রূপ থাকলেই তার প্রশংসা শুনতে হয়,—পূর্ণিমার চাঁদের কে না প্রশংসা করে! তুমি কি লোকের চোখে ঠুলি দিয়ে রাখতে চাও—না, তাদের মুখ বন্ধ করতে চাও?—

তার পর আমাকে উত্তর দেবার কোন অবসর না দিয়ে এমন ভাবে রোগী দেখতে আরম্ভ করলেন, যেন কিছুই হয় নি!

দেখতে দেখতে ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হল। বললেন,—অবস্থা ভাল নয়, রাত্রে বিপদের আশঙ্কা আছে,—একজন ভাল নার্স থাকার দরকার।

ডাক্তার কিছুক্ষণ যেন কি চিন্তা করলেন, তার পর আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—তুমি যদি রাত্রে থাকতে পারতে—

আমি নূতন শিক্ষানবিস মাত্র। আমার উপর এতবড় দায়িত্ব ডাক্তার দিতে চাইছেন দেখে বিস্মিত হলাম, মাথা নীচুকরে বললাম,

—যদি দরকার মনে করেন থাকব। কিন্তু আমি কি পারব?

ডাক্তার সোৎসাহে বললেন,—খুব পারবে, তোমার উপর আমার অসীম বিশ্বাস। তা ছাড়া, এ রোগীর উপর তোমার একটা আন্তরিক টান আছে, লক্ষ্য করেছি—

বলে তিনি উঠে পড়লেন। দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন,—আমিও দু'ঘণ্টা পরে আর একবার এসে দেখে যাব। এর মধ্যে বেশী কিছু খারাপ লক্ষণ দেখলে, তখনই আমাকে খবর পাঠাবে।

সমস্ত দিনের মধ্যে রোগীর আর জ্ঞান হল না, থেকে থেকে প্রলাপ বকতে লাগল। আমি সেই যে তার শয্যার পাশে বসেছিলাম, আর উঠিনি। গিরি একবার এসে বলল,—

—একি, বৌদি, তুমি সেই থেকে ঠায় বসে রয়েছ। ওঠ, বাড়ী যাবে, ছটা বেজে গেছে।

আমি বললাম,—আজ রাত্রে আমাকেই যে রোগীর কাছে থাকতে হবে, বাড়ী গিয়ে কি করব—

গিরি বিস্মিতভাবে বলল—সে কি! তোমাকে কে থাকতে বলল?

—ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী—

গিরি কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে বলল,—তা হলে আমাকেও থাকতে হবে, বৌদি—

—তুমি থাকবে কেন, তোমার তো আর 'ডিউটী' নেই—

—তোমার জন্য একটু কষ্ট করলামই বা! বাড়ী গিয়ে স্নান করে আসবে চল, এখানে তো আর জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে দেবে না?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম,—কিন্তু ওকে ফেলে কি করে যাই গিরি! ওর কাছে কেউ একজন—

—হয়েছে, তবেই তুমি হাসপাতালে কাজ করেছ! রোগীর উপর এত মায়া বসলে কি চলে!

গিরির কথায় আমার মনে একটা প্রবল ধাক্কা লাগল। হায়, এই হাসপাতালে যে সব রোগী আসে, তারা কি মানুষ নয়?—কেবল গিরির দোষ দিই কেন, আমি যে চোখের উপর দেখছি,—মানুষের দুঃখকষ্ট যন্ত্রণায় এরা কি গভীর উদাসীন, তাদের প্রাণের মূল্য এদের কাছে কত তুচ্ছ! যতটুকু কর্ত্তব্য, ততটুকুই এরা কলের মত করে যায়, তার বেশী একতিলও নয়। এই সেবা যত্ন শুশ্রুষার অন্তরালে যেন একটা বিরাট হৃদয়হীন শূন্যতা, স্নেহ মমতার লেশমাত্র তাতে নেই!

আমার মুখের ভাব দেখে গিরি একটু অপ্রস্তুত হয়েছিল। বোধকরি আমার সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য বলল,—তা হলে তুমিই বাড়ী থেকে চট করে ঘুরে এস বৌদি, আমি ততক্ষণ রোগীর কাছে বসছি।

অগত্যা সেই প্রস্তাবেই রাজী হলাম।

*

* *

বাড়ীথেকে হাসপাতালে যখন ফিরলাম, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। হলঘরে ঢুকতেই দেখলাম, বিমান ডাক্তার দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে গল্প করছে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। যেন আমাকে সে কোন কালে চেনে না !...এত রাত্রে ও এখানে কেন ? ওর কি কোন 'ডিউটী' আছে ? হবেও বা ! মনের কোণে একটা অস্পষ্ট সংশয় জেগে উঠল।

দূর ছাই, ওসব বাজে কথা ভাববার সময় আমার নেই !...রোগীর ঘরে গিয়ে দেখলাম, সে পূর্ব্বের মতই অসাড় অচেতন, তার জীবনদীপ ক্রমেই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। আমি যেতেই গিরির ছুটী হল।

—যত শীগ্‌গির পারি চলে আসব, বৌদি। কোন ভয় নেই, তেমন কিছু হলে, পাশের ঘরে সিষ্টারকে খবর দিও—।

বললাম,—ভয় আমার নেই, গিরি,—জগতে সব চেয়ে যে বড় ভয়, তাকেও আমি জয় করেছি। তোমাকে আর আসতে হবে না—

গিরি একটু চুপকরে থেকে গম্ভীরভাবে বলল,—না বৌদি, জীবনে এমন ভয়ও আছে, যা তুমি ভাবতে পার না!

গিরি চলে গেল। গভীর রাত্রে সেই কক্ষে রোগী নিয়ে আমি একা। আর একদিনের কথা মনে পড়ল। মৃত্যুপথযাত্রী অন্য একজনকে সেদিন বৈতরণীর তীরে পৌঁছে দিয়েছিলাম। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর রাত্রি ছিল সে,—কালসমুদ্রের তীরে বসে এমনি করেই তার লহরী গণেছিলাম। সঙ্গে ছিল আর একজন।···কিন্তু পারি নি,—কিছুতেই তাকে মৃত্যুর স্পর্শ থেকে বাঁচাতে পারি নি। এই হতভাগিনীকেও রাখতে পারব না!

হঠাৎ রোগিণী বিছানার উপর উঠে বসল এবং উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল,

—তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুর-ঝি,—ওঁকে বল, আমি দাসী হয়েও এ বাড়ীতে থাকব। এমন মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা মাথায় চাপিয়ে আমাকে বনবাসে দিও না!···ক্ষমা করবে না,—কিছুতেই ক্ষমা করবে না, এমনই কঠিন প্রাণ তোমাদের! তবে তাই হোক,—আমি চললাম—জন্মের মত চললাম—

রোগিণী শয্যায় লুটিয়ে পড়ল। সব অসাড় নিস্পন্দ, দীপশিখা বুঝি নির্ব্বাপিত হল!

ঠিক এই সময়ে ডাঃ চ্যাটার্জ্জী ঘরে প্রবেশ করলেন। রোগিণীর দিকে একবার চেয়েই বললেন—সব শেষ হয়ে গেছে!

ঘণ্টা বাজাতেই দুজন মেথর এসে হাজির হল—তাদের দিকে চেয়ে আমার মনে হল ওরাই বুঝি যমদূত! ডাক্তার রোগিণীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতেই খাট শুদ্ধ মৃত দেহ মুহূর্ত্তের মধ্যে তারা সরিয়ে নিল।···

বালির বাঁধ

গৃহমধ্যে মৃত্যুর নীরবতা, ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী আর আমি নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পরে সেই নীরবতা ভঙ্গ করে ডাঃ চ্যাটার্জ্জী মৃদু হেসে বললেন,

—যাক তোমাকে আর সমস্ত রাত জাগতে হল না। চল আমার মোটরে, বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যাব।

এই অযাচিত সহৃদয়তায়, আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। কিন্তু আত্মসম্বরণ করে ধীরে ধীরে বললাম,

—আমি নিজেই যেতে পারব, আপনাকে অসুবিধায় ফেলতে চাইনে—

—কিসের অসুবিধা? রাত একটা বাজে, তুমি যাবে কি করে?

মৃদুস্বরে বললাম,—বেশী দূরের পথ নয়, হেঁটেই আমি যাব, রোজই যাই।

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী বিস্মিতকণ্ঠে বললেন,—এই গভীর রাত্রে নির্জ্জন পথে একা যাবে তুমি হেঁটে! না—না, কিছুতেই তা হতে পারে না। চল আমার সঙ্গে—

আমি নীরবে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলাম, কোন উত্তর দিলাম না।

ডাক্তার পুনরায় বললেন,—আমি বুঝতে পারছি নে, এতে তোমার কি আপত্তি থাকতে পারে, মিসেস্ মিত্র—

ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে অধীরতা ফুটে উঠেছিল।

হায়, আমি এই হাসপাতালের সামান্য একজন নার্স, আর এই ডাক্তার আমার মনিব। তাঁর অনুরোধ যে আমার কাছে হুকুমের

চেয়েও বড়! এর পরেও ওঁর গাড়ীতে যদি না যাই, তবে সৌজন্যের প্রতিদানে তাঁকে ঘোর অপমানই করা হবে!

আমি আর কোন আপত্তি না করে ডাক্তার চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে তাঁর মোটরে গিয়ে উঠলাম আমার সমস্ত শরীর কি একটা অজ্ঞাত ভয়ে কাঁপছিল। স্বপ্নে অনেক সময় অনুভব করেছি, কে যেন আমাকে হাত পা বেঁধে সমুদ্রের জলে ফেলে দিচ্ছে। কি জানি কেন, স্বপ্নের সেই অসহায় নিরুপায় অবস্থার স্মৃতি, আমার মনে কালো ছায়ার মত কেবলই ভেসে উঠছিল।

মোটরের এক পাশে ডাক্তার বসেছিলেন, আর এক পাশে জড়-সড় হয়ে আমি বসলাম। মোটর বিদ্যুৎবেগে ছুটল।······

···মোটর ছুটে চলেছে। রাজপথ জনবিরল, দুপাশের দোকান-পাট বন্ধ, নির্ব্বাপিতদীপ উৎসবসভার মত সহরের আলোকসজ্জা ম্লান। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশে চাঁদ নাই, তারাগুলা মিটিমিটি করছে। এখানে সেখানে আকাশের চারপাশে টুকরো টুকরো মেঘ জমে উঠছে—যেন ভাবি দুর্য্যোগের পূর্ব্বসূচনা। ডাক্তার আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে! এ তো আমার বাড়ীর পথ নয়,—ক্রমে যেন সহরের বাইরের দিকে গিয়ে পড়ছি! ভয়ে আমার শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল, মুখ ফুটে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতেও সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল, কিন্তু এই বিপদের মুহূর্ত্তে তো লজ্জা করলে চলবে না। মনকে শক্ত করে, জিজ্ঞাসা করলাম,

—ডাক্তার সাহেব, আমার বাড়ী তো এ দিকে নয়—

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী আমার কাছে আরো ঘেঁসে বসে বললেন,—তা

জানি, বাড়ী ফেরবার পূর্ব্বে খোলা হাওয়ায় একটু বেড়িয়ে যাচ্ছি। রোজই আমি এমনি বেড়াই, এতে আমার সমস্ত দিনের ক্লান্তি দূর হয়। তোমার কি ভয় করছে, প্রভা ?

ডাক্তার আমার দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে ছিলেন। আমি কোন উত্তর না দিতে পেরে আরো জড়সড় হয়ে নতমুখে বসে রইলাম।

একটা জনবিরল স্থানে গাড়ী থামল। পথে আলোর অভাব দেখে বুঝতে পারলাম, এ সহরের বাইরে কোন জায়গা। সম্মুখেই একটা ফটক, সেখানে লণ্ঠন হাতে একটা লোক দাঁড়িয়েছিল।··· ডাক্তার এ আমাকে কোথায় নিয়ে এল,—ওর মতলব তো ভাল নয়!

—এ আমার বাগান বাড়ী। সহরের গোলমাল সব সময়ে ভাল লাগে না, মাঝে মাঝে এখানে এসে নির্জ্জনে বিশ্রাম করি। এতটা দূর যখন এসেই পড়েছি, চল বাগানটা একটু দেখে যাব—

বলে ডাক্তার মোটর থেকে নেমে পড়ল এবং আমাকেও নামাবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে রইলাম, আশঙ্কায় আমার প্রাণ কাঁপতে লাগল।

ডাক্তার একটু বিরক্তভাবে বলল,—এত ভয় কিসের তোমার প্রভা ? তোমাকে কি কেউ ফাঁসিকাঠে নিয়ে যেতে চাইছে ? নেমে পড়—

বলে ডাক্তার আমার একখানা হাত চেপে ধরল।

একটা বিষধর সর্প যেন তার হিমশীতল স্পর্শে আমার সমস্ত দেহ অসাড় করে দিল। ইচ্ছা হল যে, চীৎকার করে লোক ডাকি। কিন্তু

চারিদিকে কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। যদি স্বেচ্ছায় না নামি, তবে ডাক্তার জোর করে আমাকে নামাবে,—হয়ত ওই উড়ে চাকরটাই আমার গায়ে হাত দেবে!

মনে করতেই ঘৃণায় আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। আরো বেশী অপমানের ভয়ে নিজেই মোটর থেকে নেমে ডাক্তারের অনুসরণ করলাম। উড়ে চাকরটা লণ্ঠন হাতে আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল।

সুসজ্জিত ছোট-খাটো বাংলো ধরণের ঘর। ভেতর অনেকগুলো কৌচ, সোফা, চেয়ার ছড়ানো, মাঝখানে টেবিলের উপর একটা বড় আলো জ্বলছিল।

ডাক্তার একটা সোফায় বসে পড়ে আমাকে পাশে বসতে ইঙ্গিত করল। আমি মোহাচ্ছন্নের মত দরজার পাশে দাঁড়িয়েই রইলাম। একটু আগেই ডাক্তার ফাঁসিকাঠের উপমা দিয়েছিল। জানি না, ফাঁসিকাঠে ওঠবার আগে মৃত্যুপথযাত্রীর মনের কি অবস্থা হয়, কিন্তু আমার মনের অবস্থা বোধ হয় তার চেয়েও ভীষণ। এই জনহীন নির্ব্বান্ধব স্থানে বিপদের মুখ থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে! গিরির কথা মনে পড়ল, জীবনে এমন ভয়ও আছে যা আমি কল্পনা করতে পারি না,—আজ আমার জীবনে সেই মহাভয়ের দিন। যিনি অশরণের শরণ, অগতির গতি, তাঁকেই মনে মনে ডেকে বললাম,—হে অনাথনাথ, এই মহাভয় থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও, শয়তানের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার শক্তি আমাকে দাও!

ডাক্তার উড়ে চাকরটাকে ডেকে কি একটা ফরমাস করল, তার

পর সোফা থেকে উঠে আমার কাছেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে হাসতে হাসতে বলল,

—তুমি এখনও সেই অসূর্য্যম্পশ্যাই রয়ে গেছ প্রভা, সভ্য সমাজের আদবকায়দা কিছুই শেখনি। আমি তোমাকে সব শেখাব, নইলে পাকা নার্স হতে পারবে না—

—আমি ব্যাকুলভাবে বললাম,—ডাক্তার বাবু, আমি পাকা নার্স হতে চাইনে,—আমাকে দয়া করে শীগ্‌গির বাড়ী পাঠিয়ে দিন।

ডাক্তার পরম নিশ্চিন্তভাবে একটা চুরুট ধরিয়ে বলল,—বাড়ী যাবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? হলই বা একটু দেরী, ছোট ছেলে মেয়ে তো আর ফেলে আসনি যে কাঁদবে!

শিকারকে মুঠোর মধ্যে পেলে ব্যাধের যে ক্রূর আনন্দ, এও বুঝি তাই। ওর চোখে যে আমি সেই লালসারই ক্ষুধিত দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি!

বেহারা দুটো গ্লাসে করে কি একটা পানীয় নিয়ে এল। একটা গ্লাস আমার সম্মুখে রেখে ডাক্তার বলল,—পিপাসায় তোমার গলা নিশ্চয়ই শুকিয়ে উঠেছে। এটা খেয়ে ফেল, ভয় নেই, কোন খারাপ জিনিষ নয়, জাত যাবে না—

আমি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পুনরায় বললাম,—ডাক্তার বাবু, আপনি আমার মনিব, আমি দরিদ্র অসহায়া নারী, আমার উপর বিশ্বাসঘাতকতা করলে—সে কি ধর্ম্মে সইবে? আমাকে ছেড়ে দিন।

ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠল। যেন আপন মনেই বলল,—এরা সব এক জা'তের! প্রথম প্রথম কিছুতেই বাগ মানতে চায়

না, তার পর একবার গাড়ীতে জুততে পারলে, ব্যস, আর কোন বাধা নেই! আমার দিকে চেয়ে বলল,—তুমি বড় বোকা মেয়ে প্রভা,—এমন করে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই! তুমি জান না, প্রথম থেকেই কি সুনজরে আমি তোমাকে দেখেছি। আমার সঙ্গে যদি ভাব রাখ, তোমাকে একেবারে ঐশ্বর্য্যের স্তূপের উপর বসিয়ে দেব, কত বড় বড় ডাক্তার তোমাকেই তখন খোসামোদ করবে।

একটু থেমে গলার স্বর নীচু করে আবার বলল,—কেউ জানতে পারবে না,—একথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ হবে না। আর লোকনিন্দাই তো একমাত্র ভয়,—নইলে ওসব পুরাণো কুসংস্কারগুলো তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর না—

বলে ডাক্তার সহসা আমার হাত চেপে ধরে তার দিকে আকর্ষণ করল।

আমি জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ালাম। বললাম,—আপনার মত লোকের সঙ্গে এক মুহূর্ত্তও থাকা উচিত নয়। আমি চললাম, যেমন করেই হোক বাড়ী যাব—

ডাক্তার জোরে হেসে উঠল।

এমন সময় বাইরে গুরু গুরু মেঘ গর্জ্জন ও বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ শোনা গেল, বিদ্যুতের ছটা দরজা জানলা ভেদ করে প্রবেশ করতে লাগল। প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হল।

ডাক্তার হাততালি দিয়ে বলল,—বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, স্বয়ং বিধাতা তোমার যাওয়ার পথ বন্ধ করেছেন। তুমি আর বৃথা আপত্তি করো না, প্রভা,—এই ঝড়বাদলের রাতটা এখানেই দুজনে কাটানো

যাক। সকালবেলা সহরে ফিরে প্রচার করে দিলেই হবে, দুজনে একটা সিরিয়াস ডেলিভারী কেস দেখতে টালিগঞ্জে গিয়েছিলাম—!

দারুণ ভয়ে আমার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন জমাট হয়ে গেল। আমি বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম, এক পাও অগ্রসর হতে পারলাম না।

ডাক্তার বজ্রমুষ্টিতে পুনর্ব্বার আমার একখানা হাত চেপে ধরল, তার মুখে বিজয়ীর পৈশাচিক উল্লাস! আমার চোখের সম্মুখে সমস্ত আলো যেন নিবে গেল, শরীর অবশ হয়ে এল……

সহসা সিঁড়িতে দ্রুত পদধ্বনি শুনতে পেলাম। কে একজন ছুটে আসছে। পর মুহূর্ত্তেই সশব্দে দরজা খুলে গেল, ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল বিমান!—এ কি স্বপ্ন, না, সত্য?

ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতির নিস্তব্ধতার মত একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা সেই কক্ষে বিরাজ করতে লাগল। ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী ও বিমান পরস্পরের দিকে একদৃষ্টি চেয়ে যেন অগ্নিবাণে পরস্পরকে দগ্ধ করছিল। আমার হাত তখনও চ্যাটার্জ্জীর বজ্রমুষ্টির মধ্যে ছিল,—বাইরে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা তখনও তেমনি ভাবে চলছিল!

বিমানই প্রথমে সেই অসহ্য নীরবতা ভঙ্গ করে গম্ভীরস্বরে বলল,—একি ডাঃ চ্যাটার্জ্জী, আমি কল্পনাও করি নি, আপনার মত বয়স্ক লোকের এমন শয়তানী প্রবৃত্তি হতে পারে!

বাঘের মুখ থেকে মাংসখণ্ড ছিনিয়ে নিলে তার যেমন মনের অবস্থা হয়, ডাক্তার চ্যাটার্জ্জীর অবস্থাও তখন তেমনি হয়েছিল। ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে সে বলল,

—কোন সাহসে তুমি এখানে এসেছ,—জানতে চাই আমি,—রাস্কেল, স্পাই!

বিমান শান্তভাবে বলল,—আপনার মাথার এখন ঠিক নেই চ্যাটার্জ্জি, সুতরাং ইতর গালাগালিগুলো উপেক্ষাই করব। এস প্রভা, আমার সঙ্গে,—তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেব—

বলে বিমান আমার আর এক হাত দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরল।

সহসা ডাঃ চ্যাটার্জ্জী আমার হাত ছেড়ে, টেবিলের উপর থেকে একটা গেলাস তুলে নিয়ে, বিমানকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গেলাসটা বিমানের গায়ে লাগল না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দেয়ালে ঠেকে চুরমার হয়ে গেল।

বিমান অবিচলিত ভাবে দৃঢ়কণ্ঠে বলল,—আর একপাও যদি এগোবে চ্যাটার্জ্জী, তোমার মাথা গুঁড়ো করে ফেলব! এস প্রভা—

বলে সে আমাকে সবলে আকর্ষণ করল। আমি তার সঙ্গে বাংলো থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে ঝড়বৃষ্টিতে তখনো মাতামাতি চলছিল। আকাশে ঘন ঘোর গর্জ্জন, দিকে দিকে মুহুর্মুহু বিদ্যুতের চমক,—যেন ঈশানের জটাজালে লক্ষ লক্ষ ভুজঙ্গ ফণা তুলে বিশ্বধ্বংসে উদ্যত!

ফটক থেকে একটু দূরে রাস্তার ধারে বিমানের মোটর দাঁড়িয়ে ছিল। বিমান মুহূর্ত্তকাল কি ভাবল, তার পর আমার এক হাত দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে—সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ছুটে বাগান পার হয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠল। তার সেই স্পর্শে আমার মনে আজ আর কোন সঙ্কোচ

হল না, বরং একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। সেই সবল বাহুর আশ্রয়ে আমার সমস্ত ভয় যেন দূর হয়ে গেল।

মোটর দ্রুতবেগে ছুটল। দুজনে পাশাপাশি বসে, কারু মুখে কথা নেই, কথা বলবার মত মনের অবস্থাও নয়। প্রলয়ের মাতন তখন আরো প্রবল বেগে স্থরু হয়েছে, আকাশধরণী দিকচক্রবাল ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বাতাস ক্রুদ্ধ আক্রোশে থেকে থেকে আক্রমণ করছে, বৃষ্টির ঝাপটায় সর্ব্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে। তবু আমরা কেবলই ছুটে চলেছি। জোরে আরো জোরে! রূপকথার রাজপুত্র রাক্ষসদের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে হাওয়াব বেগে যখন ছুটেছিল,—সে কি কাননকান্তার, পাহাড়পর্ব্বত এমনিভাবে অতিক্রম করেছিল? রাজকন্যাও কি এমনিভাবে রাজপুত্রের সবল বাহুর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল?···এ কি স্বপ্ন, না, কল্পনা? সত্যই কি আমার জীবনে এমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে, বিমান কোন নিরুদ্দেশের পথে আমাকে নিয়ে চলেছে?

অবশেষে আমার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে গাড়ী আমার বাড়ীর সম্মুখে গিয়েই থামল। বিমান আমাকে নামিয়ে ভিতরের দরজা পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে বলল,—এইবার তুমি নিরাপদ, প্রভা,—আমি যাই—

বাইরে তখনও অবিরাম বর্ষণ চলেছে। বিমানের সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত। প্রবল ইচ্ছা হল, বলি,—বন্ধু, এই ঘোর বাদলের মধ্যে আমি তোমাকে যেতে দেব না—

কিন্তু একটা দুর্ণিবার লজ্জা আমার হৃদয় আচ্ছন্ন করে ফেলল, মুখে কে যেন পাথর চাপা দিল। হায় নারী, একটা কৃতজ্ঞতা

প্রকাশের ভাষাও কি তোমার মুখে নাই? আমি নীরবে মাটীর দিকে চেয়ে রইলাম। বিমান ক্ষণকাল থমকে দাঁড়াল,—বোধ হয় আমার মুখে কোন উত্তর শোনবার প্রতীক্ষা করে,—তার পর হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই অদৃশ্য হল।

*

*   *

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। শরীর এত ক্লান্ত যে আমার আর সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠবার সাধ্য ছিল না। নীচের একটা ঘরেই মেজেতে শুয়ে পড়লাম, ভিজ্বা কাপড় ছাড়বারও ইচ্ছা হল না। অবসাদের ভারে কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,—সকালে গিরির ডাকে ঘুম ভাঙ্গল।

—এ কি বৌদি, কোথায় ছিলে কাল রাত্রে তুমি,—কখন এলে?

গিরির মুখে সংশয় ও উদ্বেগের চিহ্ন।

জগতে কারু কাছে এ লজ্জার কাহিনী প্রকাশ না করলেও, এই হিতৈষিণী নারীর কাছে কোন কথা আমার গোপন করা চলবে না।

বললাম,—গিরি তোমার কথাই ঠিক,—জীবনে এমন বিপদও আসে, যা কখনও কল্পনা করা যায় না—

সব কথা শুনে গিরি বাঘিনীর মত আক্রোশে ফুলতে লাগল। বলল,—বৌদি, এবার আমি ঐ ডাক্তারটাকে বেশ করে শিক্ষা দিতে

চাই। ওর উঁচু মাথা যদি আমি হেট করতে না পারি, তবে আমার নাম গিরিবালা নয়!

— না, গিরি, সে সব করে কাজ নেই। তা হলে আমারই কলঙ্কপ্রচার হবে। নারীর মিথ্যাকলঙ্কও লোকে কত সহজে বিশ্বাস করে নেয়, এতো তুমি জান।

— কিন্তু এমন একটা শয়তান সমাজে ভদ্রলোক সেজে বেড়াবে! এতে প্রশ্রয় দেওয়াও মহাপাপ—

মিনতি করে বললাম,—আমার মুখ চেয়ে এও তোমাকে সহ্য করতে হবে, গিরি—

গিরি ক্ষুণ্নভাবে বলল,—আচ্ছা সে পরে হবে। তুমি এখন স্নান করে নাও,—শরীরের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, তা সহ্য করতে পারলে হয়!

অতিবড় দুঃখেও হেসে বললাম,—কিছু হবে না গিরি। এত সহজেই যদি এ শরীর ভেঙ্গে পড়বে, তবে দুঃখভোগ করবার জন্য জগতে বেঁচে থাকবে কে?

গিরি গজ গজ করতে করতে চলে গেল।

সে দিন আর হাসপাতালে যাওয়া হল না। সর্ব্বাঙ্গে একটা বেদনা বোধ করছিলাম। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত কথাই মনে আসছিল।······ এ বুঝি আমার অকৃতজ্ঞতার পাপে বিধাতার কঠিন শাস্তি। জগতে যে আমার একমাত্র বন্ধু, — আমার জন্য কোন দুঃখ মাথা পেতে নিতে যে কাতর হয় নি, কোন ত্যাগ স্বীকার করতেই কুণ্ঠিত নয়,—তাকেই আমি অনাহুত অতিথির মত দূরে ঠেলে দিয়েছি! কেবল তাই নয়,

বার বার নির্ম্মম আঘাত করে তার স্নেহের প্রতিদান দিয়েছি। সে তো আমার কাছে বেশী কিছু চায় নি,—সামান্য একটা পরিচয়ের দাবী,—একটুখানি আত্মীয়তা। কিন্তু স্বার্থপর হৃদয়হীন আমি,—তাও তাকে দিতে পারি নি! নিজেকে নিয়ে আমি এমনই ব্যস্ত, লোকলজ্জা, নিন্দার ভয় আমার এমনই প্রবল যে,—অতি সাধারণ সৌজন্য, শিষ্টাচার টুকুও ভুলে গিয়েছি। আর আমার এই অন্যায় দণ্ড সে মাথা পেতে নিয়েছে, একটী কথাও কোন দিন মুখ ফুটে বলে নি,—আমার সমস্ত অপরাধ ভুলে বিপদের মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্ধু, তোমার এই অসীম স্নেহ, কুণ্ঠাহীন ক্ষমা,—এ যে আরও ভয়ঙ্কর অস্ত্র,—এই অস্ত্রেই তুমি যে আমাকে পরাস্ত করেছ!

না,—লোক নিন্দার ভয়ে আর আমি তোমাকে দূরে ঠেলে রাখতে পারব না। যারা আমার দিকে কোন দিন ফিরেও চায় নি,—পথের কুকুরের মত তাড়িয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করে নি,—এত দিন তোমার চেয়ে তাদেরই বড় মনে করে এসেছি। আমার এ দৈন্য, এ লজ্জা রাখবার স্থান নেই!...

বিকালের দিকেও উঠতে ইচ্ছা করছিল না।

গিরি এসে বলল,—ডাঃ বোস এসেছেন, বৌদি—

আমি ব্যস্তভাবে উঠে বসে বললাম,—বিমান বাবু এসেছেন?—উপরে আসতে বল তাঁকে—

গিরি আমার দিকে চেয়ে বলল,—কাপড়টা বদলে নিলে হত না, বৌদি—

—তা হোক, তিনি কি আর আমার সাজ পোষাক দেখতে আসছেন—

বিমান ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করল। তার মুখে একটা সঙ্কোচের ভাব। ম্লান হেসে বলল,—

—কেমন আছ, প্রভা? কাল রাতে ঝড়জলে যেমন ভিজেছ, অসুখ হবার ভয় আছে।

বললাম,—অসুখ আমার কিছু করে নি,—করবেও না। আপনি বসুন ডাক্তার বাবু—

বলে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলাম।

বিমান ব্যস্ত হয়ে বলল,—থাক, থাক, আমি বসছি,—তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

আমার মনে বর্ষাব প্লাবনের মত কৃতজ্ঞতার ভাষা কূল ছাপিয়ে উঠছিল। কিন্তু একটা দারুণ সঙ্কোচ আমার কণ্ঠরোধ করে দাঁড়াল, কোন কথাই বলতে পারলাম না। মনে মনে বললাম,—আমার এ অক্ষমতা ক্ষমা কর, বন্ধু,—ভাষায় যা প্রকাশ করতে পারলাম না, তুমি নিজের অন্তর দিয়ে তা বুঝে নিও।

দুই জনেই নীরব, বোধ হয় বিমানের মুখেও ভাষা ছিল না। কিছুক্ষণ পরে আমিই সেই নীরবতা ভঙ্গ করে বললাম,—কাল যা হয়ে গেছে, তার পর ওই হাসপাতালে কাজ করা আমার পক্ষে কি সম্ভব?

বিমান একটু বিস্মিতভাবেই বলল,—ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর ভয়ে তুমি কাজ ছেড়ে দেবে? আমি থাকতে তোমাকে তা করতে দেব না!

সসঙ্কোচে বললাম,—কিন্তু উনিই যে ওখানকার কর্ত্তা, ইচ্ছা করলে পদে পদে আমাকে বিপদে ফেলতে পারেন।

বিমান উত্তেজিত ভাবে বলল,—তুমি জান না, প্রভা, এই সব লোক

কতবড় কাপুরুষ! সে এখন নিজের অপরাধ গোপন করবার জন্য ব্যস্ত হবে,—তোমাকেই ভয় করে চলবে।

একটু থেমে ইতস্ততঃ করে বিমান বলল,—তুমি যদি কিছু না মনে কর, প্রভা, একটা কথা, বলি—

—বলুন—

—হাসপাতাল থেকে ফিরবার সময় তুমি আমার গাড়ীতে আসবে,—আমি তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাব।

আমি এ প্রস্তাব শুনে বিব্রত হয়ে পড়লাম,—সহসা কোন উত্তর দিতে পারলাম না। গরীব নার্স আমি, একজন ডাক্তারের সঙ্গে যদি রোজ বাড়ী ফিরি, লোকের রসনা মুখর হয়ে উঠবে!

আমাকে নিরুত্তর দেখে বিমান মিনতিভরা কণ্ঠে বলল,

—এই সামান্য সাহায্যটুকু করবার অধিকার আমাকে দিতেই হবে, প্রভা—

তার সেই মিনতিভরা কণ্ঠস্বর আমার বুকে শেলের মত গিয়ে বাজল। একটু আগেই তো সঙ্কল্প করেছিলাম, মিথ্যা লোকনিন্দার ভয় আর করব না,—আর এই প্রথম আঘাতেই সে সঙ্কল্প ভেঙ্গে পড়তে চাইছে,—কি দুর্ব্বল আমি!

নিজেকে সংযত করে সহজভাবেই বললাম,—বেশ তাই হবে। কিন্তু আপনার যে অসুবিধা হবে—

বিমান ব্যস্ত হয়ে বলল,—না, না, এতে আর অসুবিধা কি,—তোমাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে যাব বৈত নয়।

পরদিন হাসপাতালে গেলাম। কেউ কোন কৈফিয়ৎ চাইল না,

এতবড় একটা যে ব্যাপার হয়ে গেছে, ঘুণাক্ষরেও কেউ তার আভাস দিল না। বুঝলাম, কথাটা কেউ জানতে পারে নি।

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে দেখা হল। একরাশ কাগজপত্র সামনে করে হলের মধ্যে সে বসেছিল ; আমার দিকে একবার চেয়েই আবার নিজের কাজে মন দিল, তার মুখের একটা রেখাও কুঞ্চিত হল না। আমার সঙ্গে যে কোনকালে পরিচয় ছিল, তার ভাব দেখে এমনও কেউ বুঝতে পারত না। শয়তানীতে কত পাকা হলে লোকের হৃদয় এমন কঠিন পাথর হয়ে যায়, এমন করে ভণ্ডামির মুখোস পরতে পারে?—আশ্চর্য্য এই মানুষ!...

বিমানের গাড়ীতে যে আমি রোজ বাড়ী ফিরি, কয়েকদিনের মধ্যেই সঙ্গিনীরা এটা জেনে ফেলল। বক্রোক্তি, শ্লেষ, বিদ্রূপের শাণিত বাণ আমার মাথার উপর অজস্রধারে বর্ষিত হতে লাগল। করুণা একদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলল,

—এই নূতন বন্ধুটী আবার কবে জুটল,—ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর বুঝি কপাল ভেঙ্গেছে!

বিভা বলল,—হাজার হলেও ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর বয়স হয়েছে,—আর ডাঃ বোস, নবীন যুবক, দেখতেও সুপুরুষ। প্রভা-দির বরাতজোর বলতে হবে!

কমলা চোখ টিপে বলল,—হবে না কেন, মধু থাকলেই ভ্রমর জোটে—

এসবের জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। সুতরাং আমার উপেক্ষার বর্ম্মে ঠেকে—ওদের চোখা চোখা বাণ গুলো সব ব্যর্থ হয়ে গেল। এতে ওরা আরও রেগে গেল।

বালির বাঁধ

বিমানের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ডাঃ চ্যাটার্জ্জীও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তিনি বিমানকে বা আমাকে এ প্রসঙ্গে কোন কথাই বলেন নি। মনে মনে যে তিনি একটা প্রতিশোধ নেবার মতলব আঁটছিলেন, কয়েকদিন পরেই তা বুঝতে পারলাম।

সেদিন হাসপাতালে যেতেই ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর একখানা নোটীশ পেলাম—নূতন নার্সদের একটা পরীক্ষা দিতে হবে। যারা পাশ করতে পারবে না, হাসপাতাল থেকে তাদের বিদায় নিতে হবে। বুঝলাম, এ অস্ত্র ডাঃ চ্যাটার্জ্জী আমাকেই লক্ষ্য করে প্রয়োগ করেছেন।

বাড়ী ফিরবার সময় বিমানের হাতে নোটীশখানা দিয়ে বললাম,—এবার আমাকে সত্য সত্যই কাজ ছাড়তে হল দেখছি।

বিমান নোটীশখানা পড়ে কিছুক্ষণ কি ভাবল। তার পর বলল,—এতে আর ভাবনার কথা কি? পরীক্ষায় তুমি পাশ করবে।

সসঙ্কোচে বললাম,—কিন্তু আমিতো এসব বই পড়িনি, কিছু জানিও নে—

বিমান গম্ভীরভাবে বলল—আমি তোমাকে পড়াব। রোজ দু'ঘণ্টা করে যদি পড, তাহলেই সব ঠিক করে নিতে পারবে। তোমার বুদ্ধি যে তীক্ষ্ণ, তুমি নিজে না জানলেও, আমি তা জানি।

বিপদের উপর নূতন বিপদ! ওকে আমি যতদূর সম্ভব দূরে রাখতেই চাই,—কিন্তু এ কি অদৃষ্টের পরিহাস,—আমার শতচেষ্টা সত্ত্বেও ওরই সঙ্গে নানাদিক দিয়ে জড়িয়ে পড়ছি! একবার ইচ্ছা হল বলি,—কাজ নেই আমার পরীক্ষায় পাশ করে,—হাসপাতালের চাকরী না-ই বা থাকল! কিন্তু ওর মুখে এমন একটা আগ্রহ ও উৎসাহের

ভাব দেখলাম যে, সে-কথা উচ্চারণ করতেও আমার সাহস হল না।

পরদিনই বিমান কতকগুলি ডাক্তারী বই যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে বলল,—আজথেকে তুমি আমার ছাত্রী। এ সম্বন্ধে তোমার কোন আপত্তি শুনব না, অবাধ্যতা করলে শাস্তি দেব—

ব'লে সে হাসতে লাগল।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। মনে মনে ভাবলাম,—তোমার ছাত্রী হতে পারব, জীবনে এত বড় সৌভাগ্য কখনও কল্পনা করি নি!

মুখে বললাম,—আপনি সমস্ত দিন হাসপাতালে খেটে এসে, সন্ধ্যাবেলা আবার আমাকে পড়াতে বসবেন, এতে যে আপনার বড় কষ্ট হবে—

আমার কণ্ঠস্বরে বোধহয় একটু আবেগ ফুটে উঠেছিল। বিমান একবার আমার মুখের দিকে চাইল, তার পর ধীরে ধীরে বলল,—কিছু কষ্ট হবে না,—আমার যদি ভাল লাগে, তোমার আপত্তি কি!

ওর কাছে বসে পড়তে প্রথমে আমার বড় সঙ্কোচ হত। অন্তঃপুরের বাইরে এসে যেসব পুরুষকে দেখেছি, তাদের কারু দৃষ্টি তো সরল নিঃসঙ্কোচ নয়,—তার মধ্যে আছে সুপ্ত কামনার ছায়া, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতই লালসার স্ফুলিঙ্গ। সে দৃষ্টির সামনে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠতাম, বিষধর সর্প দেখলে লোকে যেমন সভয়ে এড়িয়ে চলে, তেমনি ভাবে এড়িয়ে চলতাম। কিন্তু বিমান তো তাদের মত নয়, সে যেন এক স্বতন্ত্র জগতের জীব! তার নিষ্পাপ মনের নিষ্কলুষ দৃষ্টি যেন চোখে মুখে ফুটে উঠত। শরতের মেঘহীন নির্ম্মল আকাশের

দিকে চাইলে মন যেমন প্রসন্ন হয়, তার উৎসাহদীপ্ত মুখের দিকে চাইলে মন তেমনই প্রফুল্ল হত।

পড়াতে পড়াতে এক এক সময়ে সে ভাবে তন্ময় হয়ে উঠত, যেন জ্ঞানরাজ্যের অতল রহস্যের মধ্যে মগ্ন হয়ে যেত। তখন তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতাম, কি যে সে বলত, কিছুই আমার কাণে যেত না। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে সে যখন আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করত—বুঝতে পারছ তো? তখন আমার চমক ভাঙ্গত, লজ্জায় কুণ্ঠায় জড়সড় হয়ে উত্তর দিতাম—না, ভাল বুঝতে পারিনি—

আমার অপ্রস্তুত ভাব দেখে বিমান মৃদুহেসে বলত,—পড়ার দিকে মন না দিলে বুঝবে কি করে?—আচ্ছা, আবার বলছি, শোন—

এখন থেকে আমার জীবনের যে অধ্যায় সুরু হল, তা সুখ কি দুঃখ, আনন্দ কি বিষাদ, কে আমাকে বলবে! ওরে কে জানত, আমার মনের গোপন স্তরে স্তরে, হৃদয়ের পরতে পরতে এত সাধ, এত কামনা বাসনা ঘুমিয়েছিল! আজ যখন তারা জেগে উঠে দল বেঁধে তাদের দাবী নিয়ে দাঁড়াল, আমার হৃদয়ের সমস্ত অর্গল—সংযমের বাঁধ যে তারা ভেঙ্গে ফেলবার উপক্রম করল!

বহুদিন পূর্ব্বে আর একবার জীবনে বসন্ত এসেছিল। যৌবনের পুলকে সেদিনও আমার সারা অঙ্গ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেদিন যে-দেবতার পূজার অর্ঘ্য সাজিয়েছিলাম, সে তো তা

গ্রহণ করে নি। তাই উষার প্রথম রক্তিমার মত দেখতে দেখতে সে শুভলগ্ন মিলিয়ে গেল। অনাহুত উপেক্ষিত বসন্তদূত যে অজানা পথে এসেছিল, সেই পথেই সকলের অলক্ষ্যে কখন অভিমানে ফিরে গেল। ধনীর দুলাল আমার স্বামী তখন দুশ্চরিত্র বয়স্যদের নিয়ে বাইরে আনন্দের সন্ধানে ব্যস্ত; কিন্তু ঘরে তারই জন্য যে একজন আনন্দের ডালি সাজিয়ে বসেছিল, তা সে কখনও চেয়েও দেখেনি। তার পর এক দিন আমার কাছেই তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল বটে,—কিন্তু সে আমার যৌবনের উপহার নেবার জন্য নয়, আমার হাতে রোগের সেবা পাবার জন্য। আমি তাকে নিরাশ করিনি, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার রোগশয্যার পাশে বসে পাতিব্রত্যের ঋণ শোধ করেছি!······

আজ সেই বহুদিনের অনাদৃত বিস্মৃত যৌবন আবার বুঝি ফিরে এল! রাজপুত্রের সোনার কাঠির স্পর্শে, ঘুমন্ত রাজকন্যা জেগে উঠল, পার্ব্বত্য নির্ঝরের রুদ্ধমুখ কে যেন সহস্রধারায় খুলে দিল। পুরুষের মনের স্পর্শেই যে নারীর যৌবন, আজ আমার সমস্ত চেতনার মধ্য দিয়েই তা অনুভব করতে পারছি। চন্দ্রের আকর্ষণে সাগরের জলে যেমন জোয়ার ওঠে, আমার হৃদয়ের কাণায় কাণায় তেমনি আজ যৌবনের বন্যা কূল ছাপিয়ে উঠেছে।

কিন্তু এর আঘাতে আঘাতে আমার হৃদয় যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল! বাইরের জগতের কাছে একে কেমন ক'রে লুকিয়ে রাখব, সেই কঠোর সাধনাতেই আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। এক দুরন্ত অশান্ত যেন আমার হৃদয় দুর্গে বন্দী; কণ্ঠস্বরের ভঙ্গী,

হাসির রেখা, দৃষ্টির বিদ্যুৎ—কোনও দ্বার পথে যাতে সে পালাতে না পারে, তারই জন্য প্রহরীরূপে জেগে থেকে, আমার মন শ্রান্তির ভারে অবসন্ন হয়ে পড়ল!

তবু আজ মনে হয়, এই দুঃখের দিন গুলিই ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দের দিন! ঐ দুঃখসমুদ্র মন্থন করেই আমি অমৃতের সন্ধান পেয়েছিলাম। সেই দুর্দ্দিনের অন্ধকার রাত্রেই আমার মন প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে অভিসার করেছিল,—আমার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এক নূতন সুরে, নূতন ছন্দে, অনির্ব্বচনীয় পুলকে!

*

* *

সেদিন একটু সকালে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলাম। মনে করলাম, বিমানের জন্য আর অপেক্ষা করব না, একাই বাড়ী চলে যাব। কিন্তু নীচে নেমেই দেখি, বিমান ফটকের কাছে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে বলল,

—তোমার আজ সকালে ছুটি হবে, তা আমি জানি। চল সহরের বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি,—সমস্ত দিনটা নানা ঝঞ্ঝাটে কেটেছে।

মনের আনন্দ চেপে বললাম,—কিন্তু বাড়ীতে যে কাজ ছিল—

—থাক কাজ,—তোমার যে মস্তবড় সংসার, দু-ঘণ্টা তদারকী করতে দেরী হলে কোন ক্ষতি হবে না—

বলে সে হাসতে লাগল, আমিও হেসে ফেললাম।

গাড়ী হাওড়া পুল পার হয়ে দক্ষিণ মুখে ছুটল। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় চলেছেন?

—শিবপুরের বাগানে। তুমি কোনদিন সেখানে গিয়েছ?

ঈষৎ লজ্জিতভাবে বললাম,—হ্যাঁ, অনেকদিন আগে একবার গিয়েছিলাম।...

সে যেন আজ কত যুগের কথা! আমি তখন শ্বশুর শ্বাশুড়ীর আদরের বৌ-রাণী, আমাকে খুসী করবার জন্য তাঁরা সব সময়ে ব্যস্ত। বৌ-রাণীকে নিয়ে বেড়াতে এলেন শ্বশুর শ্বাশুড়ী,—সঙ্গে দাস দাসী, লোকজন। পাঁচ সাত খানা গাড়ী ভর্ত্তি করে সদলবলে আমরা যখন বাগানে প্রবেশ করলাম, লোকে সেই সমারোহ দেখে ভাবল কোন একজন বড়দরের রাজা কি মহারাজা বুঝি সপরিবারে এসেছেন। সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। আমার গায়ে ছিল প্রচুর অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্য,—যে সব মেয়ে বাগানে বেড়াতে এসেছিল, তারা বিস্ময়সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল, সঙ্গীনীদের কানে কানে কি সব বলতে লাগল। সমস্ত দুপুর বেলাটা আমরা বাগানে কাটালাম, চড়ুই ভাতী করলাম। হাস্যপরিহাসে আনন্দকলরবে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল।...

আর আজ! বার বৎসর পরে সেই আমিই এসেছি,—সর্ব্বহারা নিরাভরণা বিধবা, দৈন্য ও রিক্ততার প্রতিমূর্ত্তি, জীবনের স্রোতধারা যার অর্দ্ধপথে থেমে গেছে, এ সংসারে যার আর কোন প্রয়োজন নেই; কেউ যাকে চায় না, সাক্ষাৎ অমঙ্গল বলেই দূরে ঠেলে রাখে। আমার মর্ম্মস্থল ভেদ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বের হয়ে এল।

গাড়ী বাগানের সামনে এসে থামল। অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলছিলাম। ভিতরে একদল গুজরাটী মেয়ে বেড়াচ্ছিল, বিচিত্র বসনে সজ্জিত, রঙের যেন হাট বসেছে। কিন্তু সেদিকে আমার আদৌ দৃষ্টি

ছিল না, নিজের চিন্তাতেই বিভোর ছিলাম। বিমান নীরবে আমার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে বিমান ডাকল—প্রভা!

তার ডাক শুনে আমি চমকে উঠলাম, আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। অপ্রতিভভাবে বললাম,—এই গুজরাটী মেয়েদের দেখতে আমার বড় ভাল লাগে, এরা সত্যিই সুন্দরী!

বিমান হেসে বলল,—আর বাঙ্গালী মেয়েরা বুঝি দেখতে বিশ্রী! আমার তো মনে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালী মেয়েরাই সুন্দরী, তাদের শ্যামলবর্ণের মধ্যে যে লাবণ্য, তা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। পাঞ্জাবী, মারাঠী, কাশ্মীরী মেয়েরা সুন্দরী বটে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেন কোমলতার অভাব, চোখ ধাঁধিয়ে তোলে, কিন্তু মন স্নিগ্ধ করে না।

বললাম,—মেয়েদের সৌন্দর্য্য নিয়ে এত কথাও আপনি ভেবেছেন,—আমি জানতাম,—আপনার বুঝি ওদিকে চোখই পড়ে না!

বিমান সলজ্জ হেসে বলল,—ভারতের অনেক প্রদেশেই ঘুরেছি কিনা, কাজেই এসব দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে।

বাগানের দক্ষিণদিকে গঙ্গার ধারে আমরা এসে পড়েছিলাম। বিমান সেদিকে চেয়েই সোৎসাহে বলে উঠল—কি সুন্দর! ইচ্ছা করে এইখানে বসে বসে দিনের পর দিন গঙ্গার শোভা, নীল আকাশের শোভা দেখি!

সত্যই বড় সুন্দর দেখা যাচ্ছিল। সূর্য্য তখন অস্ত যায় নি, তার রক্তরাগ পশ্চিম আকাশের ঘননীল মেঘের উপরে পড়ে, এক অপূর্ব্ব শোভা হয়েছিল। আর গঙ্গার বুকের উপর সেই মেঘের ছায়া মৃদু তরঙ্গে

কম্পিত হচ্ছিল। কে যেন মুঠো মুঠো রঙ নিয়ে জলের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে। মাথার উপর সীমাহীন আকাশ—দূর দিগন্তের কোলে গঙ্গার বারিপ্রবাহের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

সবুজ ঘাসের উপর দুজনে পাশাপাশি বসে পড়লাম। এর আগে এত নিবিড় একান্তভাবে ওকে কখনও পাই নি। বিমান আমার একহাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল,

—মাঝে মাঝে এসব জায়গায় এলে মনটা হাল্‌কা হয়। সহরের ইটকাঠের অরণ্যের মধ্যে মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে, প্রকৃতির সঙ্গে তার সহজ স্বাভাবিক সম্বন্ধ ভুলে যায়। তার মন হয়ে ওঠে রুক্ষ, শুষ্ক, নীরস, অর্থ সংগ্রহ করা ছাড়া জীবনে আর যে কোন কাজ আছে, এ সে ভাবতেই পারে না। তবু এ সব জায়গা যেন মরুভূমির মধ্যে এক এক টুকরা 'ওয়েসিস', মানুষের হারাণো মনের সূত্রটা এখানে এলে খুঁজে পাওয়া যায়।

আমার সমস্ত দেহে ওর স্পর্শে পুলক সঞ্চার হচ্ছিল,—মন এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ভরে উঠেছিল। একবার মনে হল হাতখানা সরিয়ে নেই, এত ঘনিষ্ঠভাবে ওর সঙ্গে মেশা ঠিক নয়। কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করলাম, ভাবলাম, তাতে সহজ ব্যাপারটাকে আরও জটীল করে তোলা হবে;—যে বন্ধুত্বের মধ্যে দোষের কিছু নেই, সংশয়ের ছায়া পড়ে তা মলিন হয়ে উঠবে!

ধীরে ধীরে বললাম,—সহর থেকে দূরে পল্লীর শ্যামল শোভার মধ্যে যারা থাকে, নদীর তীরে বাসা বাঁধে, প্রকৃতির সঙ্গে যাদের নিত্য পরিচয়, তারাই কি বেশী শান্তিতে থাকে? আমার বিশ্বাস তাদেরও

দুঃখ কষ্ট উদ্বেগের অন্ত নেই। তারা আবার মনে করে—সহরের লোকেরাই বুঝি সুখী।

—অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, মানুষের কোন অবস্থাতেই শান্তি নেই!

—বোধ করি তাই। নিজের মনের ভিতর যদি শান্তি না থাকে, তবে পৃথিবীর কোথাও তা খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিমান কোন উত্তর দিল না, একমনে কি যেন ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আমার দিকে চেয়ে বলল,

—জীবনের অভিজ্ঞতা আমারও খুব বেশী নয়;—কিন্তু যেটুকু হয়েছে, তাতে মনে হয়, শান্তি খুঁজে বেড়ালে পাওয়া যায় না, মরীচিকার মত আরও দূরে সরে যায়। সে আসে কর্ম্মের মধ্য দিয়ে, কর্ত্তব্যের কঠোর পথে।

একটু শ্লেষের সঙ্গেই বললাম,—যার কর্ম্ম নেই, কর্ত্তব্যের পথ রুদ্ধ, তার কি?

আমার দিকে চেয়ে বিমানের মুখে ঈষৎ বিস্ময়ের চিহ্ন দেখা দিল, ক্ষণকাল নীরব থেকে গম্ভীরভাবে সে বলল,

—তোমার কথাই বলি,—কতবড় মহৎ ব্রত তুমি নিয়েছ—পীড়িত আর্ত্তদের সেবা.—এর মধ্যে যদি তুমি সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিতে পার, শান্তি নিশ্চয়ই আসবে।

হায় রে, মানবসেবার মহৎব্রত! হৃদয় যার উপবাসী,—বড় বড় কথার আড়ম্বরে সে কি শান্তি পাবে! পুরুষ অন্ধ, তাই নারীর হৃদয় তারা বুঝতে পারে না, মনে করে তারা যন্ত্র,—সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা বলে

তাদের কিছু নেই, নীতি ও ধর্ম্মের উপদেশ মেনে সোজা পথেই তারা চলবে।

অদূরে একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়েছিলেন, বোধ হয় বাঙ্গালী দম্পতী। সঙ্গে তিন চারটী ছেলে মেয়ে, ছোট দুটী দুজনের কোলে, বড় দুটী নিকটে খেলা করছিল। স্বামী নিম্নস্বরে কি যেন বললেন, আর স্ত্রী তা শুনে হেসে লুটিয়ে পড়লেন। বোধ হয়, তাঁর হৃদয়ের কোন স্তরে আনন্দের উৎস খুলে গিয়েছিল।

তাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললাম,

—ওরা কি সুখী নয়, শান্তি কি ওরা পায় নি? অথচ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, এ সব বড় বড় আদর্শ, মানবসেবার মহৎ ব্রতের কথা কিছুই ওরা জানে না। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে নারী চায়—গৃহ, স্বামী, সন্তান, তাতেই তার সুখ শান্তি,—কোন উচ্চ আদর্শ বা মহৎ ব্রত পালনে নয়। সেই অনিশ্চিত দুর্গম পথে, তাকে যারা জোর করে ঠেলে দেয়, তারা ভুল করে।

উত্তেজনার বসে এতগুলো কথা বলে ফেলে নিজেই লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। ছি, ছি, আমার মনের গোপন দৈন্য, কেন আজ কাঙালের মত প্রকাশ করে ফেললাম? ও আমাকে কি ভাববে!

বিমান কিছুক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে রইল, তার পর ধীরে ধীরে বলল,

—তোমার কথাই হয়ত সত্যি প্রভা,—কিন্তু মানুষ নিজের ভুল সব সময়ে বুঝতে পারে না!

আমার মন ব্যথায় টনটন করে উঠল। আমি তো ওর কাছে এই

উত্তর চাইনি,—আরো—আরো কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু ও কি সত্যাই অন্ধ, অথবা অন্ধতার ভাণ করছে? না—না, ভাণ ও কিছুতেই করতে পারে না। মহৎ উদার ও, কিন্তু বড় কঠিন নির্ম্মম!

সূর্য্য তখন পশ্চিম দিগন্তের অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে, সপ্তমীর চাঁদ ধীরে ধীরে আকাশ প্রান্তে কখন এসে দাঁড়িয়েছে। বাগানে লোকের ভিড় কমে এসেছে, এখানে সেখানে দুই চার জন যারা আছে, তারাও বাড়ী ফেরবার উদ্যোগ করছে। বিমান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল,—এইবার বাড়ী ফিরি চল!

*

*   *

কয়েকদিন পরের কথা। কি একটা কারণে হাসপাতালে যাইনি, দুপুর বেলা শুয়ে শুয়ে একখানা বই পড়ছিলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল নিকটের একটা দেয়ালের আড়াল থেকে ঘুঘুর ডাক কানে ভেসে আসছিল। জানলা দিয়ে উপরে আকাশের খানিকটা দেখা যায়। জলহারা দু' একখানা সাদা মেঘ পাল তুলে সেই নীলসমুদ্র যেন পাড়ি দিচ্ছে। নীল আকাশের বুকে সাদা মেঘের এই নিরুদ্দেশ যাত্রা আমার বড় ভাল লাগে, দেখে দেখে কোন দিন ক্লান্তি হয় না। ঈশানের ঝড়ের তালে তালে যে মেঘ প্রলয়নৃত্যে মেতে ওঠে, সেই যে আবার নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে শ্বেতপতাকা উড়িয়ে শান্তির বার্ত্তা বহন করে আনে, এ ভাবতে আমার পরম বিস্ময়। শান্তি ও সংগ্রাম, সৃষ্টি ও প্রলয়—এ যেন দুই যমজ ভাই, একই মায়ের বুকে দুই দিক জুড়ে আছে!

—তুমি যে আজ হাসপাতালে যাওনি, প্রভা?

কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে চেয়ে দেখি, বিমান দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। আঁচলটা তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে উঠে বসে বললাম—আসুন—

বিমান একটা চৌকিতে বসে পড়ে বলল,—এ সময়ে আমাকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছ, নয় ? হাসপাতালে গিয়ে শুনলাম. তুমি যাওনি, ভাবলাম হয়ত কোন অসুখ করেছে,—তাই দেখতে এলাম।

আমার হৃদয়ে কে যেন অমৃতের প্রলেপ বুলিয়ে দিল। জগতে অন্ততঃ একজন লোকও আমার জন্য ভাবে ! কিন্তু মুখে একটু বিদ্রূপের সঙ্গেই বললাম,

—আমার শরীরের জন্য আপনার এতখানি ভাবনা দেখে সুখী হলাম। কিন্তু ভাবনার কোন কারণ নেই, রোদে পোড়া, জলে ভেজা কাঠের মত এ শরীরের ক্ষয় নেই।

—আজকাল তুমি বড় বেশী কথা বলতে শিখেছ, প্রভা, আর আমার উপর তোমার নিষ্ঠুরতা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তুমি কি বলতে চাও, তোমার শরীরের কথা ভাববারও আমার অধিকার নাই ?

মনে মনে বললাম,—যদি কারো সে অধিকার থাকে বন্ধু, তবে তোমারই আছে। কিন্তু এ ভাবকে প্রশ্রয় দিলে তো আমার চলবে না, জোয়ারের মুখে তৃণগুচ্ছ আশ্রয় করেও আমাকে বাঁচতে হবে !

মুখ গম্ভীর করে বললাম,—আমি গরীব নার্স, বিধবা, দেহের কথা ভাবাও আমার পক্ষে পাপ !

বিমানের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে সে বলল,

—পাপ পুণ্যের এই অদ্ভুত ধারণা কে তোমাকে শেখাল ? শরীরটা যখন রাখতেই হবে, তখন তাকে সুস্থ রাখাই কি ঠিক নয় ? ইচ্ছা করে যে দেহ ক্ষয় করে, সে আত্মহত্যা করে।

বড় দুঃখেই হাসি পেল। বললাম,—সেকালে হিন্দুবিধবাদের চিতায় পুড়িয়ে মারত। এখন আইনের ভয়ে তা হতে পারে না বটে, কিন্তু যন্ত্রণা তার চেয়ে কিছু কম নয়। বরং তখন একেবারেই সব শেষ হয়ে যেত, আর এখন তুষানলে তিলে তিলে দগ্ধ হতে হয়।

বিমান একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলল,—এর জবাব দেবার সাধ্য আমার নেই, সে চেষ্টা করে অপরাধের বোঝা আরো ভারী করব না। কিন্তু সেদিন যে-কথা তুমি বলেছিলে, তা আমি ভুলিনি, কেবলই ভাবছি, এর কি কোন প্রতিকার নেই, অবুঝ সমাজের অন্যায় অত্যাচার নির্ব্বিচারে মাথা পেতে নিতে হবে ?

আমি কোন উত্তর দিলাম না, আমার বুকের ভিতর রক্তস্রোত যেন দ্রুততালে নৃত্য করতে লাগল।

বিমান একটু চুপকরে থেকে বলল,—আমাকে তোমার বন্ধু ও হিতৈষী বলে জানবে, প্রভা। তোমার জীবন যাতে ব্যর্থতার মরুভূমির মধ্যে শেষ না হয়—এই আমার একান্ত কামনা।

আমি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললাম,—সে আর হয় না, বন্ধু! জীবনের পাশাখেলায় আমার কপালে যে দান পড়ে গেছে, তা কিছুতেই ওলটানো যাবে না। বিধিলিপি খণ্ডন করতে পারে, এমন সাধ্য কারু নেই—

বিমান একটু উত্তেজিত স্বরেই বলল,—বিধিলিপি, অদৃষ্ট, ও সব ভীরুর কল্পনা, অক্ষমের সান্ত্বনা। নিজের অদৃষ্ট নিজের হাতেই লোকে ভাঙ্গে গড়ে। কেউ বা খেলায় হেরে, হাসিগান থামিয়ে আলো নিবিয়ে, অন্ধকারের মধ্যে সব শেষ করে দেয়, আর যার শক্তি থাকে,

সে নূতন করে যাত্রা সুরু করে। আমি জানি তোমার মধ্যে সে শক্তির অভাব নেই।

আমার সমস্ত দেহ থর থর করে কাঁপছিল। এ সব কথার অর্থ কি? আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে যে কামনা হাহাকার করছে, ও কি তা বুঝতে পেরেছে?

ভয়ে ভয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললাম,—কি বলতে চাও, তুমি—

বিমান একটু ইতস্ততঃ করে বলল,—যদি বন্ধু বলে আমাকে স্বীকার কর, বলবার অধিকার দাও, তবেই বলতে সাহস করি—

আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে বললাম,—বল—

বিমান একটু চুপকরে থেকে বলল,—আমার একজন বন্ধু ডাক্তার—শিক্ষিত, উদারহৃদয়, বুদ্ধিমান লোক। এ পর্য্যন্ত বিয়ে করেন নি,—বলেন, মনের মত কাউকে দেখতে পান নি। তোমার কথা তাঁকে আমি বলেছিলাম। শুনে বললেন, তাঁকে পত্নীরূপে পাওয়া তো পরম সৌভাগ্যের কথা—

আমার হৃৎপিণ্ডে কে যেন একটা লৌহদণ্ড দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল, সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগল, তীব্র বেদনায় মন অবসন্ন হয়ে পড়ল, প্রাণহীন কাঠের পুতুলের মত আমি নীরব হয়ে রইলাম।

বিমান একটু থেমে পুনরায় বলল,—আমি তোমার মত জানতে এসেছি। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। আমার বিশ্বাস, তাঁকে বিয়ে করলে তুমি সুখী হবে।

আমি তবু কোনও উত্তর দিলাম না।

আমার ভাব দেখে বিমান একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গেই বলল,

—তা হলে এতে তোমার—

আমি নিজেকে আর সংবরণ করতে না পেরে আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠলাম,—না, না,—তা কিছুতেই হতে পারে না! তুমি কি আমাকে এই কথা বলবার জন্যই এসেছিলে? ওঃ কি নিষ্ঠুর তুমি—

বলেই দ্রুতপদে পাশের ঘরে গিয়ে আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। আর একমুহূর্ত্তও তার সামনে থাকবার সাহস আমার ছিল না,—কি জানি যদি আত্মসংযম হারিয়ে ফেলি!

আমার সমস্ত অন্তর মথিত করে হাহাকার উঠতে লাগল, বাণবিদ্ধ হরিণীর মত মাটীতে লুটিয়ে পড়ে আমি ছটফট করতে লাগলাম। বন্ধু, এর চেয়ে নিজের হাতে তুমি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলে না কেন, আমার হৃৎপিণ্ড টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললে না কেন? তৃষার্ত্ত হয়ে শীতল জলের জন্য যে তোমার কাছে অঞ্জলি পেতে দাঁড়িয়েছিল, তাকে দিলে তুমি তরল অনলের ধারা!

*

*   *

কতক্ষণ অর্দ্ধমূর্চ্ছিতবৎ মেঝেতে পড়েছিলাম, জানি না। গিরি এসে দরজায় ঘন ঘন করাঘাত করতে উঠে দরজা খুলে দিলাম।

গিরি আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বলল,—তুমি সারাদিন শুয়ে শুয়ে কাঁদছিলে বৌদি,—কি হয়েছে তোমার ?

আমি লজ্জায় মরে গেলাম। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বললাম,—কই কিছুই তো হয় নি,—এমনই শুয়েছিলাম।

গিরির মুখ থেকে সন্দেহের ছায়া দূর হল না। একটু ইতস্ততঃ করে সে বলল,—ডাক্তার বোস এসেছিলেন আজ ?

থতমত খেয়ে বললাম,—হ্যাঁ, এসেছিলেন একবার, কিন্তু তখনই আবার চলে গেলেন।

গিরি আর কিছু না বলে, নিজের কাজে গেল। মনে হল যেন তার চোখের কোণে ঈষৎ চাপাহাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল। ছি—ছি, গিরি কি ভাবল! আর যে এ লুকোচুরি খেলতে পারি নে!

পরদিন হাসপাতাল থেকে ফেরবার সময় দেখলাম, বিমান আসেনি,

ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে বলল,—ডাক্তার সাহেবের শরীরটা ভাল নয়, হাসপাতালে তাই আসেন নি।

এ অসুখ শরীরের, না, মনের? আমি যে তার মনে আঘাত দিয়েছি, এখনও কি সে তা ভুলতে পারে নি?

কিন্তু পরদিনও যখন বিমান এল না, আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। সত্যই কি তার কোন কঠিন অসুখ করল? যদি তাই হয়!… মনে হল, একবার ছুটে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু ও কি ভাববে? না—না, তা হতে পারে না! গিরিকে খবর নিতে পাঠাবো? কিন্তু গিরিও যদি আমার মনের কথা ধরে ফেলে, তা'হলে তো লজ্জার সীমা থাকবে না! নিরুপায় হয়ে বিমানেরই প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে রইলাম। পুরুষ জাতি কি স্বার্থপর, ওরা মনে করে জগতে ওরাই কেবল ভালবাসতে পারে, নারীর যে মৌন বেদনা, অসীম ধৈর্য্য, তা অনুভব করবার শক্তি ওদের নেই!

নিজের মনের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে শিউরে উঠলাম, আমি যে কতদূর দুর্ব্বল, অসহায়, তা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলাম। নদীর স্রোত যেমন অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে তটভূমির মূল শিথিল করে ফেলে, অবশেষে সে একদিন সশব্দে ভেঙ্গে পড়ে, এও বুঝি তেমনই! এই গোপন আত্মপ্রতারণার চেয়ে নিষ্ঠুর সত্যের সামনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বুক পেতে আঘাত নেওয়া বরং ভাল!

চিঠি লিখে পাঠালাম,—বন্ধু, কেমন আছ, খবর দিও। পারত নিজে একবার এস।

বালির বাঁধ

নির্লজ্জতার সীমা নেই,—এমন ভাবে বিমানকে চিঠি লিখব, ত কোন দিন কল্পনা করি নি। কিন্তু বিদ্রোহী মনকে শাসন করবার ক্ষমতা আজ আমি হারিয়ে ফেলেছি।……

অপরাহ্নের সূর্য্য পশ্চিম আকাশের রক্তিমার মধ্যে ডুবে গেল, পাখীরা নীড়ে ফিরে এল, তবু তার দেখা নাই। এক একবার মনে হচ্ছিল, কার যেন পদ শব্দ শুনতে পাচ্ছি—যেন কার কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসছে। কিছুই তো নয়, নিছক আমারই মনের ভ্রম!… যদি আমাকে না দেখতে পেয়ে সে ফিরে যায়!……নীচে নেমে এসে বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। ফটক পার হয়ে ওই যে কে আসছে। সে-ই তো! আমি ছুটে উপরে উঠে এলাম। তাড়াতাড়ি একখানা বই টেনে নিয়ে জানালার ধারে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগলাম।…পদ শব্দে বুঝতে পারলাম, সে এসে ঘরের ভিতর দাঁড়াল। আমার বুক দুরু দুরু কাঁপতে লাগল। প্রবল ইচ্ছা হল, ওর দিকে একবার চেয়ে দেখি,—কিন্তু অতিকষ্টে সে ইচ্ছা দমন করে, বইয়ের পাতার উপর আরও বেশী ঝুঁকে পড়লাম। কয়েক মুহূর্ত্ত ঘরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল, একটা উদ্বেগব্যাকুল প্রতীক্ষায় ঘরের বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠল।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে সে-ই ডাকল—প্রভা!

আমি সাড়া দিলাম না, যেন ডাক শুনতে পাইনি।

—প্রভা!

কণ্ঠস্বর আবেগকম্পিত, একটা বিষাদের সুরও যেন তার মধ্যে বেজে

উঠেছিল। এবার আর আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না, ফিরে চেয়ে যতদূর সম্ভব শান্তভাবে বললাম,—

—ও, তুমি এসেছ! ভাবছিলাম আর বুঝি আসবেই না। কেমন আছ?

বিমান আমার কাছে এসে কুণ্ঠিত ভাবে বলল,

—আমাকে ক্ষমা কর প্রভা!

আমার দুই চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর বান নেমে এসেছিল। কোন উত্তর দিতে না পেরে আমি মুখ নীচু করে রইলাম।

বিমান ব্যথিত স্বরে বলল,—ছি ছি, কেঁদনা প্রভা,—তোমার চোখের জল আমি সহ্য করতে পারিনে।

তার এই মমতার স্পর্শে আমার মন আকুল হয়ে উঠল, আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

বিমান কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল, তার পর মিনতিভরা কণ্ঠে বলল,—কেন এমন করে কাঁদছ প্রভা,—কি তোমার দুঃখ বল, আমি প্রাণপণে তা দূর করবার চেষ্টা ক'রব।

—তুমিতো আমার জন্য অনেক করেছ বন্ধু,—তারই ঋণ এ জন্মে শোধ করতে পারব না—

বিমান কুণ্ঠিতভাবে বলল,—ও কথা ব'লে আমাকে আর লজ্জা দিও না। আমি তোমার জন্য অসাধারণ কিছুই করি নি, আত্মীয় স্বজনের জন্য লোকে এটুকু করেই থাকে।

—কিন্তু আমি তো তোমার কেউ নই—

কতবার আর তোমাকে সে কথা ব'লব। রক্তের সম্বন্ধই কি

কেবল মানুষকে আত্মীয় করে? তার চেয়েও বড় জিনিষ আছে, পরকে যা আপনার করে নেয়। আমার যদি কোন ছোট বোন থাকত, তার জন্যও কি আমি এমনই করতাম না? কিন্তু তুমি তো বললে না, কি তোমার দুঃখ?

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম,—কি হবে বলে? আমার সে দুঃখ ঘোচবার নয়!

সে দিন আমার কি হয়েছিল জানিনে,—যে ছলনাময়ী নারী জগতে চিরদিন অনর্থ ঘটিয়েছে, সেই আদিম নারীই বুঝি আমার মধ্যে জেগে উঠেছিল! শত্রুর দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করবার জন্য তার যত কিছু শক্তি কৌশল কিছুই সে প্রয়োগ ক'রতে কুণ্ঠিত হয় নি! আজ সে-কথা মনে হলে লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়ে পড়ে, মাটির ভিতর মিশে যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সবই আমাকে বলতে হবে, কিছুই গোপন করব না,—নইলে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে না!

বিমান ব্যগ্র কণ্ঠে বলল,—তোমাকে বলতেই হবে প্রভা!

আমি কিছুক্ষণ কোন উত্তর দিলাম না, জানলার ধারে গিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে, আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছলাম। তার পর বিমানের দিকে চেয়ে ধরা গলায় বললাম,—

—সে তোমার শুনে কাজ নেই। শুধু এই টুকু দয়া করে বল, আর কখন এমন ক'রে কঠিন শাস্তি আমাকে দেবে না।—তোমাকে একদিন না দেখতে পেলে আমার যে কি দুর্ভাবনা হয়, কেমন ক'রে তা বোঝাব।

বিমান যেন একটু চমকে উঠল, তার চোখের কোণে বিস্ময় ঘনিয়ে এল। কিন্তু মুহূর্ত্তে তা দমন করে সহজ সুরেই সে বলল,—

—এখনো তোমার ছেলেমানুষী যায় নি, প্রভা! আমি তোমাকে শাস্তি দিতে পারি, এ তোমার বিশ্বাস হয়?

মৃদুহেসে বললাম,—তোমার উপর বিশ্বাস কি?

সে হাসির মধ্যে কি ছিল জানি না,—স্পষ্ট দেখলাম, বিমান চঞ্চল হয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে উঠে বলল,—এখন আমি যাই প্রভা, বিশেষ একটা কাজ আছে।

আবদারের সুরে বললাম,—এই তো পাঁচ মিনিট হল এসেছ, এরই মধ্যে যাবার জন্য ব্যস্ত! একটু বস, এখনই আমি আসছি।

কয়েক মিনিট পরে, বরফ দেওয়া এক গ্লাস আনারসের সরবৎ নিয়ে যখন আমি ফিরে এলাম,—দেখলাম, বিমান অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন চিন্তা করছে, তার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন সুস্পষ্ট। আমার পদশব্দে সচকিত হয়ে বলল,

—ওটা বুঝি গুরু দক্ষিণা,—কিন্তু আমি তো আজ তোমার গুরুগিরি করতে আসিনি—

—তাই বলে গুরুদক্ষিণা বাদ যেতে পারে না!

একটু থেমে বললাম,—তোমাকে সেবা করবার এই যে সামান্য সুযোগটুকু পাই, এই আমার জীবনের আনন্দ, বিধাতা এর চেয়ে বেশী সুযোগ আমাকে দেননি। তুমি কি বুঝবে বন্ধু, নিজেকে ত্যাগ ক'রে, আত্মদান ক'রেই নারীর জীবনের সার্থকতা,—যাকে সে ভালবাসে —তার জন্য সর্ব্বস্ব দিতেও সে কুণ্ঠিত হয় না!

বিমান নীরবে সরবৎটুকু খেয়ে ফেলল, আমার এই স্পষ্ট ইঙ্গিতেও সে কোন সাড়া দিল না।...ওর হৃদয়ের একটা দিক কি একেবারে অসাড় ? নারীর সম্বন্ধে ওর কি কোন চেতনা নাই ?

ব্যাধ যেমন তার বাণ ব্যর্থ হলে আরও অধীর হয়ে ওঠে, আমারও মনের অবস্থা ঠিক তেমনি হল।

বললাম,—যদি রাগ না কর, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রব—

বিমান ম্লান হেসে বলল—কি জিজ্ঞাসা ক'রতে চাও ?

—আমাকে বিয়ে করবার জন্য সেদিন তো খুব উপদেশ দিলে ;—কিন্তু তুমি নিজে বিয়ে করনা কেন বল তো ?

বিমান সলজ্জ হেসে বলল,—তোমাকে সে কথা বলিনি বুঝি, বিয়ে আমার শীগ্‌গিরই হবে !

আমার হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি ধরে কে যেন জোরে টান দিল, অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত বেদনায় টন টন করতে লাগল, রুদ্ধনিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায়, কার সঙ্গে ?

—সে আমার এক বাল্যসঙ্গিনী। মা-বাপেরা অনেক আগে থেকেই সম্বন্ধ ঠিক করে রেখেছিলেন—

—এখন তোমরা দুজনে সেটা পাকা ক'রে নেবে—

ব'লে আমি জোরে হেসে উঠলাম, আমার হাসির শব্দে বিমান যেন একটু চমকিত হল।

ঈর্ষা, ক্ষোভ ও নৈরাশ্যে আমার হৃদয় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।... আমার উপর এতদিন ও যে মমতা দেখিয়েছে, আমার জন্য এতকিছু করেছে, সে কেবল ওর দয়া! একটা দরিদ্র অসহায় নারীর প্রতি

করুণা—ভিক্ষুককে লোকে যেমন ক'রে মুষ্টিভিক্ষা দেয়! আর সেই যে বাল্যসঙ্গিনী, ওর হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা সেই অধিকার করে আছে! কে সে তরুণী? এতই কি সুন্দরী বিদুষী সে? আমি কি তার পদ-নখরের যোগ্যও নই? সেই অপরিচিতা তরুণীর উপর ঈর্ষায় বিদ্বেষে আক্রোশে আমার অন্তর জ্বলতে লাগল।

বিমান মৃদু হেসে বলল,—তোমার সঙ্গে শীলার একদিন পরিচয় করিয়ে দেব,—সে ভারী খুসী হবে।

ওর ওই হাসি বুঝি বিদ্রূপেরই নামান্তর! মনের জ্বালা চেপে মুখে হেসে বললাম,—বেশত, আমিই গিয়ে তাঁর সঙ্গে একদিন আলাপ করে আসব।

বিমান বাইরের দিকে চেয়ে বলল,—এবার আমি যাই প্রভা, আকাশে মেঘ উঠে এসেছে, এখনই ঝড়বৃষ্টি হবে।

বলতে বলতেই বাতাসের ঝাপটা এসে জানলা দরজায় নির্ম্মমভাবে আঘাত করতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি এল।

বললাম,—এর মধ্যে যাবে কি করে? ঝড় জল থামুক!

কিন্তু সে দুর্য্যোগ শীঘ্র থামবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ঝড় ও বৃষ্টিতে মিলে প্রলয় নৃত্য সুরু করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সন্ধ্যার অন্ধকার আগেই নেমে এসেছিল, এখন সে অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে আকাশ পৃথিবী আচ্ছন্ন করে ফেলল। বাইরে যেমন ঝড়, আমার হৃদয়ের মধ্যেও তেমনি প্রবল ঝড় ব'য়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তারই সঙ্গে একটা অদ্ভুত আনন্দও অনুভব করছিলাম। কিসের এ আনন্দ? শিকারকে আয়ত্তের মধ্যে পেলে ব্যাধের যে আনন্দ, একি

তেমনই ? উত্তেজনায় আমার রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, হৃৎপিণ্ড ঝড়ের মতই দ্রুততালে স্পন্দিত হচ্ছিল।

বিমান অধীরভাবে ঘরের ভিতর পায়চারী করছিল। অতর্কিতভাবে কেশরীকে পিঞ্জরে বন্দী করলে সে যেমন মুক্তিলাভের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে, বিমানও তেমনি অস্থির হয়ে উঠেছিল। আমি তার সেই অস্থিরতা যে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি, এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ করলাম না। ঘরের জানলা দরজা বন্ধ ক'রে আলো জেলে দিয়ে বললাম,

—বসো বন্ধু,—যেতে যখন পারছ-ই না, তখন আজ তুমি আমার বন্দী, আমার ইচ্ছামতই চলতে হবে—

বিমান যেন একান্ত নিরুপায়ভাবেই আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল, ঝড়ের ঝাপটা থেকে থেকে জানলা দরজায় এসে আঘাত করছিল,—যেন লক্ষ লক্ষ দানব ক্রুদ্ধ আক্রোশে গর্জ্জন ক'রে ফিরছিল।

দুজনেই নীরবে প্রকৃতির সেই রুদ্রলীলার ভীষণতা প্রাণ দিয়ে অনুভব করছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সেই নীরবতা ভঙ্গ করে আমি বললাম,

—আজ আমরা সমস্ত পৃথিবীর থেকে বিচ্ছিন্ন, যেন কোন সুদূর দ্বীপে নির্ব্বাসিত। এখানে তুমি আর আমি ছাড়া কেউ নেই,—বাহ্য জগৎ, লোকালয়, সমাজ কারু সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই—কাউকে লজ্জা, ভয় বা সঙ্কোচ করবারও নেই। এমন একান্ত নিবিড়ভাবে তোমাকে যে পাব, এ কখনো ভাবতে পারিনি !

বিমানের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। ভগ্নস্বরে সে বলল,

—এ দুর্যোগ সারারাত চলবে, থামবার কোন লক্ষণ দেখছি নে; এখন জোর ক'রে বেরিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই—

ভীতিকম্পিতস্বরে বললাম,—সে কি কথা!—এই দুর্যোগের রাত্রে একা এই শূন্যপুরীতে কিছুতেই আমি থাকতে পারব না,—গিরি নিশ্চয়ই আজ আসবে না!

বিমানের মুখ আরও বিবর্ণ হয়ে গেল, যেন আপন মনেই সে বলল, —তাইতো তোমাকে একা ফেলেই বা যাই কি ক'রে!

—যাবার এমনই কি দরকার? অজলে অস্থলে তো আর পড়নি!

বিমান অপ্রতিভ ভাবে বলল,—না, না, তা বলছিনে, কিন্তু—

—এর মধ্যে কিন্তু কিছু নেই, কোন কিন্তু-ই আমি মানব না, এখানেই তুমি আজ থাক্‌বে—

বিমান ভয়ে ভয়ে বলল,—তা হ'লে তুমি—

—কোন অসুবিধা হবে না,—তুমি এই খাটে থাকবে, আর আমি মেজেতে মাদুর পেতে শোব—

বিমান ইতস্ততঃ করে বলল,—তার চেয়ে আমি বরং বারান্দায় থাকব—

আমি অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললাম,—এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকার রাত্রে বারান্দায় থাকবে কেন, আর আমিই বা থাকতে দেব কেন?

'কেন,' তা মুখ ফুটে বলবার সাহস বোধ হয় বিমানের ছিল না, সে নীরবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি তার কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে বললাম,—বলবে না আমাকে?

বিমান মুখ তুলে একবার আমার দিকে চেয়ে চমকে উঠল, কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল।

আমি ধীরে ধীরে তার কাঁধের উপর হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বললাম,

—আমি ব'লতে পারি তোমার মনের কথা!—কিন্তু তুমি পুরুষ, সামান্য একজন নারীকে দেখে ভয় কি তোমার?……

বাইরে অবিরামধারায় তখনও বর্ষণ চলছিল,—বুঝি প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত চলবে—!

*

*   *

সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গতেই দেখলাম, বিমান ঘরে নাই, কখন উঠে গেছে জানতেও পারিনি। নীচে নেমে দেখলাম, বাইরের দরজা খোলা, বিমান কোথাও নাই। এমন ক'রে আমাকে কিছু না ব'লে, সে চলে গেল কেন? কিন্তু পরক্ষণেই গতরাত্রের কথা যখন মনে পড়ল,—লজ্জায়, অনুশোচনায় আমার সমস্ত দেহ আড়ষ্ট হয়ে গেল। নিজের উপর একটা দারুণ ঘৃণা হল। ছি, ছি, এতদিনের ধৈর্য্য, সংযম, সাধনা ক্ষণিকের বিস্মৃতিতে বিসর্জ্জন দিয়েছি! বন্ধুত্বের এমন অপমান আর কেউ কখনও করেনি, কৃতজ্ঞতার ঋণও এমনভাবে আর কেউ বুঝি শোধ দেয় নি!

প্রভাতের আকাশ নির্ম্মল। নয়নমনোহর নীলিমা সুদূরপ্রসারিত দিগন্তের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। কাল যে এই আকাশই মেঘে মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল, বজ্রবিদ্যুৎ বর্ষণে মিলে প্রলয়নৃত্যে মেতে উঠেছিল, আজ তার এই প্রশান্তনির্ম্মল রূপ দেখে কে তা বিশ্বাস করবে? ওই বাহিরের আকাশের মত আমার হৃদয়েও

কাল ঝড় উঠেছিল, কেমন করে কি ঘটেছিল, আজ আমি নিজেই তা ভাবতে পারছিনে,—শুধু দেখছি,—রেখে গেছে একটা গাঢ় কালিমার দাগ—স্মৃতির জ্বলন্ত অনলরেখা!

আমার উপর বিমানের নিশ্চয়ই নিদারুণ ঘৃণা হয়েছে, স্নেহ দয়া মমতা একান্ত অপাত্রেই যে, সে দান করেছিল, একথা আজ সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে পেরেছে। তার সেই করুণা ও মমতার সুযোগ নিয়ে আমি তাকে পঙ্ককুণ্ডে টেনে নামিয়েছি! আত্মগ্লানিতে আমার সমস্ত অন্তর বিষাক্ত হয়ে উঠল। বিমান আর কখনও আমার কাছে ফিরে আসবে না,—যদিই বা আসে, আমি তাকে মুখ দেখাব কেমন ক'রে? এ পোড়া মুখ নিজের হাতেই যে ভাল করে পুড়িয়েছি! এখন থেকে সে যে আমাকে ঘৃণা করবে, এ কল্পনা করতেই সর্ব্বাঙ্গে বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা অনুভব করতে লাগলাম।

একটু বেলা হলে গিরি এসে বলল—কাল রাত্রে কিছুতেই আসতে পারলাম না, বৌদি,—যে ঝড় বৃষ্টি, এক মুহূর্ত্তও বিরাম ছিল না! তোমার কথা ভেবে সমস্ত রাত আমার ভাল ক'রে ঘুম হয় নি, এই শূন্যপুরীতে কি করে যে একা ছিলে—

বলতে বলতে আমার মুখের দিকে চেয়েই গিরি চমকে উঠল!

—একি চেহারা হয়েছে তোমার বৌদি, কোন ভয় পাওনি তো?

হায়, কেমন করে গিরিকে বলব, একা আমি ছিলাম না! তার চেয়ে একা যদি থাকতাম, অপদেবতায় আমার ঘাড় মটকাত, তা হলেই হত ভাল!

আমি কেন উত্তর দিতে না পেরে গিরির দৃষ্টি এড়িয়ে অন্য দিকে

চেয়ে রইলাম। গিরি আমার ভাব দেখে ক্ষণকাল অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর উপরে চলে গেল।

একটু পরে ফিরে এসে বলল,—ডাক্তার বাবুর গরদের চাদরটা পড়ে আছে দেখছি, কাল সন্ধ্যাবেলা তিনি এসেছিলেন বুঝি ?

একটা মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিলে সহস্র মিথ্যা বীভৎস মূর্ত্তিতে সামনে এসে দাঁড়ায়—ওরা যে রক্তবীজের ঝাড়! না, আমি মিথ্যার জালে জড়িয়ে নিজকে আরও বেশী হীন করব না,—সত্যকেই সাহস করে প্রকাশ করব !

বললাম,—হ্যাঁ, এসেছিলেন, রাত্রেও কাল এখানেই ছিলেন—

সামনে ভূত দেখলে কারু মুখ যেমন পাংশু হয়ে যায়, গিরির মুখের ভাবও তেমনি হল। দুই পা পিছিয়ে ঢোক গিলে জড়িত স্বরে সে বলল,

—এখানেই ছিলেন ?

—হ্যাঁ,—উপরের ঘরেই—

এই নিদারুণ আঘাতের জন্য গিরি বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না। সে অবসন্নের মত নিস্তব্ধ ভাবে কিছুক্ষণ বসে রইল, তার পর উঠে ধীরে ধীরে বাইরে চলে গেল,—আমাকে আর একটা কথাও জিজ্ঞাসা করল না।

হায়, কেন গিরিকে একথা বললাম,—যে-লজ্জা, যে-কলঙ্ক নিজের মধ্যে ছিল, তা কেন এমন ভাবে বাইরে ছড়িয়ে দিলাম! আমার অসময়ের বন্ধু, সেও বুঝি আজ আমাকে ত্যাগ করে গেল! আমার মাথা ঘুরতে লাগল, চারদিক আমি অন্ধকার দেখতে লাগলাম।

সমস্ত দিন কি ভাবে কাটল বলতে পারিনে। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল, কিন্তু আমি সেই অন্ধকারের মধ্যেই মাটীতে মুখ গুঁজে পড়ে রইলাম, ঘরে আলো জ্বালতেও আমার প্রবৃত্তি হল না।······

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম—কে যেন উপরে আসছে, অতি ধীর দ্বিধাগ্রস্ত সে শব্দ—যে আসছে, তার পা যেন আর উঠতে চাইছে না। বিমানের পায়ের শব্দ তো এমন নয়, সে তো অনেক দূর থেকেই আমি বুঝতে পারি!

শব্দ দরজার কাছে এসে থেমে গেল, তার পর পূর্ব্বের মতই নিস্তব্ধ! একি কোন অশরীরী প্রেতাত্মা? হোক তা, শরীরী বা অশরীরী কিছুতেই আর আমার ভয় নেই!

কিছুক্ষণ পরে সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে কে যেন ডাকল—প্রভা—

ক্লান্ত জড়িত অবসন্ন স্বর—তবু সে স্বর বুঝতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হল না। আমার সমস্ত শরীর থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। ও যে অন্ধকারের মধ্যে আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, আলোতে ওর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াতে হয় নি, এ আমার পরম সৌভাগ্য!

কোন সাড়া না পেয়ে বিমান আবার ডাকল—প্রভা!

এবার আর আমি চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

বিমান ব্যাকুলকণ্ঠে বলল,—কেঁদ না প্রভা! জানি, আমি তোমার কাছে যে-অপরাধ করেছি, তার ক্ষমা নেই। তবু আমাকে ক্ষমা

কর, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ দাও, এই আমার ভিক্ষা—

আমি এবারও কোন উত্তর দিলাম না, দেবার সাধ্যও আমার ছিল না। মনে মনে বললাম,—বন্ধু, তুমি তো কোন অপরাধ কর নি—অপরাধী আমি, প্রায়শ্চিত্ত আমারই প্রয়োজন!

বিমান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,—সমাজে এখন তোমার সম্মান রক্ষা করবার দায়িত্ব আমারই। অনেক ভেবে দেখলাম, তা করবার একমাত্র উপায়, আমাদের দুজনের বিয়ে করা। তুমি সম্মতি দাও, প্রভা—

আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল,—সমস্ত অন্তর মথিত আলোড়িত করে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। একি আনন্দ, না, বিষাদ, না, উভয়ের অতীত আর কিছু? বিমান সত্যই মানুষ না, দেবতা? পাপীকে মহৎলোক ক্ষমা করে শুনেছি, কিন্তু তাকে এমন ক'রে গৌরবের আসনে বসাতে চায়, এ যে কল্পনারও অতীত!··· কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে বন্ধু! তুমি যদি একদিন আগেও এ কথা ঘুণাক্ষরে বলতে, দেবতার আশীর্ব্বাদের মত তোমার দান মাথা পেতে নিতাম। আমার অভিশপ্ত জীবন সার্থকতায় ভরে উঠত। অনেকদিন থেকে তোমাকেই যে আমি মনে মনে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছি, বরমাল্য তোমারই গলায় পরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তুমি তো আমাকে সে ভাবে কখনও চাওনি,—স্নেহ, দয়া, মমতা, কর্ত্তব্যের বেড়া দিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত করে রেখেছিলে। আর আজ যে আমি নিজের কাছেই নিজে ধিক্কৃত। ছলনার জাল পেতে তোমাকে সিংহাসন থেকে ধূলায় টেনে

নামিয়েছি,—তোমার অসীম স্নেহের অপমান করেছি! সেই কৃতঘ্নতার পুরস্কার স্বরূপ তোমার দেওয়া সম্মান কেমন ক'রে আমি গ্রহণ ক'রব বন্ধু! নিজেকে এত হীন আমি কিছুতেই করতে পারব না,—সঙ্গে সঙ্গে তোমার জীবনও অভিশাপের আগুনে পুড়িয়ে দেব না।

অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বললাম,—আমাকে ক্ষমা কর তুমি,—এ কিছুতেই হতে পারে না—

বিমান মিনতিভরা কণ্ঠে পুনরায় বলল—ভেবে দেখ প্রভা, এতে দোষ নেই—

দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলাম—না—

বিমান নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। সেই অন্ধকারের মধ্যে তাকে না দেখতে পেলেও আমি স্পষ্টই অনুভব করলাম, নৈরাশ্যের বেদনায় তার মুখ কালো হয়ে উঠেছে! আমার চিত্ত অধীর উতলা হয়ে উঠল,—প্রবল ইচ্ছা হল, ছুটে ওর কাছে গিয়ে বলি,—বন্ধু, তোমার এ দুঃখ আমি আর সহ্য করতে পারি নে,—আমাকে তুমি যে ভাবে নিতে চাও, সেই ভাবেও নাও, কোন অভিমান, কোন স্বাতন্ত্র্য আমি আর রাখতে চাইনে!

কিন্তু একটা ঘোর অবসাদ আমার দেহ মন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারলাম না! একটু পরে মনে হল বিমান সেখানে নাই। অস্থিরভাবে উঠে আলো জ্বাললাম। সত্যই তো, বিমান নিঃশব্দে কখন চলে গেছে, আমার নির্ম্মম আঘাত সে সহ্য করতে পারে নি। হতভাগিনী, তুই একি করলি,—তোরই জন্য যে সর্ব্বস্বত্যাগ করতে চেয়েছিল, তুই তাকে ভিক্ষুকের মত দূরে ঠেলে দিলি!

*

*   *

গিরি কয়েকদিন আসেনি। আমিও আর হাসপাতালে যাইনি, মনে করেছিলাম, আমাকে সে একেবারেই ত্যাগ করল। কিন্তু আজ আবার সে এসে ম্লানমুখে আমার কাছে দাঁড়াল। একটু ইতস্ততঃ করে বলল,

—ডাঃ বোস আর তোমাকে বরখাস্ত করবার জন্য চাটুয্যে লিখে দিয়েছে বৌদি—

তা হলে কি এ কলঙ্ক বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে, কালামুখে লোকে আরও ভাল ক'রে কালি মাখিয়ে দিয়েছে? গিরিকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছিল না, কিন্তু উৎকণ্ঠাও দমন করতে পারছিলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম—কেন বলত?

গিরি কিছুক্ষণ কোন উত্তর দিল না, অবশেষে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বলল,—তোমাদের দুজনের নামে কি সব কথা লোকে রটনা করেছে, ডাঃ চাটুয্যে—

বললাম,—থাক, আর শুনতে চাইনে। আমি নিজেই আর ওখানে যেতাম না, ওরা যে ছাড়িয়ে দিয়েছে, ভালই হল—!

—কিন্তু—

বলতে গিয়ে গিরি থেমে গেল। তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললাম,—

—নিজের জন্য কিছু ভাবিনে গিরি, যে দিকে দুচোখ যায় চলে যাব। কিন্তু বিমান বাবুর যে সর্ব্বনাশ করে গেলাম—তাঁর মাথা চিরদিনের জন্য হেট করে দিলাম, এ ভাবতে আমার বুকে আগুন জ্বলে উঠছে!

গিরি কিছুক্ষণ করুণবিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে বলল,

—একটা কথা তোমাকে এতদিন বলিনি, বৌদি,—বিমান বাবুর অনুরোধেই গোপন করেছিলাম।······সেই কাল রাত্রির পর বিমানবাবুই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর চেষ্টাতেই হাসপাতালে তোমার কাজ হয়েছিল—আমার কোন কৃতিত্ব নেই। জগতে তাঁর চেয়ে বড় হিতৈষী তোমার আর কেউ নেই।

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম! ওঃ, আমার কৃতঘ্নতার সীমা নেই! যে আমার জন্য কেবলই নিজেকে দান করেছে, কোন কিছু প্রত্যাশা করেনি, তারই মাথায় আমি অপমানের বোঝা চাপিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করলাম! ভগবান, আমার এ মহাপাপের প্রায়চিত্ত কি?

গিরিকে বললাম,—বিমান বাবুকে একবার ডেকে আনতে পার গিরি?

গিরি সাগ্রহে সম্মত হল।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা বিমান এল। আমি তাকে দেখে চমকে

উঠলাম। একি সেই বিমান? সেই সহাস্য বদন, উজ্জ্বলদীপ্ত চক্ষু, সর্ব্বাঙ্গ তেজ ও উৎসাহে ভরা—এযে তার ছায়ামূর্ত্তি! কতকাল পরে রোগশয্যা থেকে যেন উঠে এসেছে। ওর চোখের কোণে কালি পড়ে গিয়েছে, দুই গণ্ড নিষ্প্রভ, ললাটে চিন্তার রেখা। আমার বুকের মধ্যে হাহাকার ক'রে উঠল। ছুটে গিয়ে তার দুহাত জড়িয়ে ধ'রে বললাম,

—বন্ধু—একি হয়েছে তোমার! তুমি কি আমার জন্য এমন করে দেহপাত করবে?

বি‹মান› বেদনাভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল, তার পর কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

বললাম,—তোমার আদেশই মাথা পেতে নেব, বন্ধু,—নিজেকে আমি তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম—

বিমান বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল, এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সে যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

......কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে সে আমার মাথার উপরে তার ডান হাতখানি রাখল আমার সমস্ত দেহমন যেন জুড়িয়ে গেল!

কি দুর্ব্বল অসহায় এই মানুষ! তার সমস্ত সুখের কল্পনা, আশার স্বপ্ন এক নিমিষে মিলিয়ে যায়! সে যেন ছায়াবাজীর পুতুল,—অন্তরাল থেকে যে কঠোর নিয়তি তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তার নিষ্ঠুর খেয়াল কখন কোন দিকে নিয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না। কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে নূতন সংসার পাতবার চিন্তায় যখন বিভোর ছিলাম, তখন কে জানত, প্রভাতে আমার মাথায় অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হবে!

বালির বাঁধ

সকাল বেলা উঠে দেখলাম, টেবিলের উপর একখানা চিঠি পড়ে আছে। খামের উপর মেয়েলী হাতে বিমানের নাম লেখা। বিমানই নিশ্চয় ভুলে চিঠিখানা ফেলে গিয়েছে। কে লিখেছে তাকে এই চিঠি? একদিকে পরের চিঠি গোপনে খুলে পড়বার কুৎসিত প্রবৃত্তি, অন্যদিকে মনের প্রবল কৌতূহল। এ কৌতূহল জগতে অনেক অনর্থ ঘটিয়েছে—আজও সেই জয়ী হল!

ছোট চিঠি, আট দশ লাইন মাত্র লেখা—শীলা নামে একটি মেয়ে লিখেছে বিমানকে।······বাল্যের কৈশোরের সেই ভালবাসা সবই কি ভুলে গিয়েছ তুমি? তোমার স্মৃতিপটে কি জলের দাগের মতই সে সব মিলিয়ে গিয়েছে? কিন্তু আমি যে তোমারই জন্য পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে, আরতির প্রদীপ জ্বেলে বসে আছি! রূপকথার রাজকন্যাকে নিষ্ঠুর রাজা যেমন বনবাসে দিয়েছিল, এরাও যে তেমনি করেই আমাকে নির্ব্বাসনে পাঠাচ্ছে! যে হৃদয় তোমাকে উৎসর্গ করেছি, তা অন্য কাউকে দিয়ে আমি তো দ্বিচারিণী হতে পারব না। তুমি যদি এই ঘোর সঙ্কট থেকে আমাকে রক্ষা না কর, তবে মৃত্যুই আমার একমাত্র গতি!······

এ সেই বিমানের বাল্যসঙ্গিনীর চিঠি—যার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা ঠিক হয়েছিল!...

একটা আগুনের হলকা আমার সর্ব্বাঙ্গের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল,—শিরায় শিরায় মর্ম্মে মর্ম্মে বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা অনুভব করলাম। আমার জন্য একটী তরুণজীবন এই ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, আমারই নিঃশ্বাসে আর একজনের পূজার মন্দিরে আরতির দীপ নিবে যাবে!

আমি হতভাগী তো নিজের সবই খেয়েছি, আবার আর একজনের প্রিয়জনকে কেড়ে নিয়ে তার সর্ব্বনাশ করব? রাক্ষসী আমি, মূর্ত্তিমতী অকল্যাণ আমি! হা ভগবান, একি বিষম সঙ্কটে আমাকে ফেললে?

শীলা

আমার বিয়ে হবে শুনে সহপাঠিনী ইন্দিরা এসেছে আমাকে অভিনন্দন করতে।

ইন্দিরার রূপ ইন্দ্রাণীরই মত, তার দিকে চাইলে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। ভ্রমরকৃষ্ণ কেশের কথা কাব্যে পড়েছি, কিন্তু ইন্দিরার চুল দেখলে তার অর্থ ঠিক বোঝা যায়। সেই ভ্রমরকৃষ্ণ কোঁকড়ানো চুল গুচ্ছে গুচ্ছে ওর সুন্দর ললাট, কপোলের উপর পড়ে এক অপূর্ব্ব শোভা সৃষ্টি করেছে। মেঘের কোলে বিদ্যুৎ আছে জানি, কিন্তু ইন্দিরার হাস্যোজ্জ্বল লীলাচঞ্চল চোখ থেকেও বিদ্যুৎ যেন ঠিকরে পড়ছে। বাঙ্গলা দেশের দুর্ভাগ্য, নারীর রূপের কোন মর্য্যাদা এখানে নেই, পূজার নির্ম্মাল্যের মত কোন দেবতা তাকে সাদরে বরণ করে নেয় না। হাটে যেমন গরু, ভেড়া, ছাগল বিক্রী হয়, এই বাঙ্গলার বিয়ের হাটেও তেমনি বিকি কিনি চলে। তাই ইন্দিরার মতো মেয়েরও বর জোটে না, তার বাপ মাকে নিজেদের দারিদ্র্য স্মরণ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে হয়। অনেক সময় ভাবি, বাঙ্গলা দেশে মেয়েরা কেন জন্মায়,—জন্মায়ই যদি, তবে সেকালের রাজপুতদের মত বাঙ্গালীরাও মেয়েকে নুণ খাইয়ে মেরে ফেলে না কেন? বাঙ্গলার

তরুণেরা অক্ষম, নির্বীর্য্য, কাপুরুষের দল—ওরা কেবল চিনেছে টাকা,—তাও আবার উপার্জ্জন করবার ক্ষমতা ওদের নেই,—মেয়ের বাপকে শোষণ করে ওরা সেই লালসা মিটাতে চায়। ওরা বোঝে না, মেয়েরা এই কাপুরুষদের কখনও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু যখন কোন সত্যিকার মানুষের পরিচয় পায়, তখন তাদের মন শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে, অনুরাগে পূর্ণ হয়ে ওঠে। বিমানের মধ্যে এমনই সত্যিকার মানুষের পরিচয় আমি পেয়েছিলাম,—আমার হৃদয় সেখানে ভুল করেনি।

সহপাঠিনীদের মধ্যে রটে গিয়েছিল,—আমাদের এটা 'লভ-ম্যারেজ' —আমরা খাঁটী বিলাতী প্রথায় 'কোর্টসিপ' করেছি। কেউ কেউ এতে খুসী হয়ে অভিনন্দন করে চিঠি লিখেছিল,—কেউ কেউ তীব্র শ্লেষ বিদ্রূপ করতেও ছাড়েনি। উত্তরে লিখেছিলাম, তা যদি হয়েই থাকে, ক্ষতি কি ? এই হিন্দুর দেশে এককালে 'লভ-ম্যারেজ', কোর্টসিপের তো ছড়াছড়ি ছিল, আজ হঠাৎ তাতে অরুচি হয়ে উঠল কেন ?

ইন্দিরা চিঠি লেখেনি, সশরীরেই এসেছিল।

ইন্দিরা এসে বলল,—ধন্যি মেয়ে যাহোক, অবশেষে স্বয়ম্বরা হলি ? পবিত্র হিন্দুসমাজে, যেখানে সকলেই চলবে চিরকালের বাঁধা রাস্তা ধ'রে—সেখানে কোন সাহসে তুই পায়ে হাঁটা মেঠো পথ ধরলি ?

হেসে বললাম,—বক্তৃতা ছেড়ে সোজা কথা বল। তোর মনে ঈর্ষা হচ্ছে। তা হলে মাসীমাকে ব'লে তোর জন্যও একটা স্বয়ম্বর সভার যোগাড় করি। যে অতুলনীয় রূপ, অপ্সরী ভেবে আকাশ থেকে দেবতারাও নেমে আসতে পারেন।

ইন্দিরা গম্ভীর হয়ে বললে,—উঁহু, কেবল স্বয়ম্বরসভা হলে হবে না, আমি চাই খাঁটী আর্য্যপ্রথায় বীর্য্যশুল্কা হতে—

—সে আবার কি রে!

—তা বুঝি জানিস্‌নে! সুন্দরী রাজকন্যারা যার তার গলায় বরমাল্য দিতেন না,—যিনি বীর্য্যবলে অন্য সকলকে পরাস্ত করতে পারতেন, কেবল তাঁরই সে সৌভাগ্য হত।

—এত কথাও জানিস্‌! কিন্তু একালে তো তা হবার জো নেই, ভাই,—এই বাঙ্গলাদেশে কুমারীদের বরমাল্য পেতে হলে কোন বীর্য্যের প্রয়োজন হয় না, মেয়েরা এখানে বিনামূল্যেই বিকায়, বরং বরকেই টাকা দিয়ে কিনতে হয়।

—সেই জন্যই তো আমি বিয়ে ক'রব না ঠিক করেছি। কোন কাপুরুষের গলায় বরমাল্য দেওয়ার চেয়ে চিরকুমারী থাকাই ভাল।

আমি কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় একরাশ শাড়ী ও অলঙ্কারের নমুনা নিয়ে মা সেখানে এলেন। ইন্দিরাকে দেখে বললেন,

—এই যে তুমি এসেছ, মা। আমরা সব সেকালের মানুষ, আমাদের পছন্দ তো তোমাদের চোখে লাগবে না, তোমরা দুজনেই সব দেখে শুনে ঠিক কর।

ইন্দিরা হেসে বলল,—মাসীমা আবার সেকেলে হলেন কবে? আমরা আপনাকে সেকালের কোঠায় কিছুতেই ঠেলে দিতে রাজী নই।

মা হাসতে হাসতে বললেন,—চিরকাল কি তোমরা আমাকে ধরে রাখতে পারবে মা, বিদায় একদিন নিতেই হবে!......ওই যা—

ওঁকে আবার কয়েকখানা দলিল বের করে দিতে হবে। তুমি বস মা, আমাকে না বলে পালিয়ে যেও না, আমি এখনই আসছি।

ইন্দিরা আমার দিকে অপাঙ্গে চেয়ে বলল,—কিন্তু বিয়ের দিনটা বড় পিছিয়ে ফেললেন, মাসীমা. এই আষাঢ় মাসে হলেই ভাল হত—

—আমার কি আর দেরী করবার ইচ্ছা মা, শুভকর্ম্ম যত শীগ্গির হয়ে যায় সেই ভাল। কিন্তু উনি বলেন, একটা মেয়ের বিয়ে, এত তাড়াতাড়ি করবার দরকার কি? একটু উদ্যোগ আয়োজনও তো করতে হবে!

মা চলে গেলে বললাম,—তোর মত বেহায়া তো দেখিনি, মার কাছে ওই সব বিশ্রী কথা!

ইন্দিরা চোখ ঘুরিয়ে বলল,—কথাগুলো বুঝি বিশ্রী হল! তুই মনে মনে দিনরাত যা ভাবিস্, মুখ ফুটে বলতে পারিস্নে, আমি সেইগুলো তোর হয়ে বলে দিলাম।

আমি রাগ করে বললাম,—তবে তুই-ই এসব কাপড়-গয়না পছন্দ কর, আমি কিছু করতে পারব না—

—বারে, বিয়ে করবি তুই, আর পছন্দ করব আমি! তা হলে বর পছন্দ করবার ভারটাও আমার উপরে দিলেই পারতিস্!

—দিইনি, পাছে নিজেই যদি দখল করে বসিস্—

ইন্দিরা তার গভীর নীল চোখের কটাক্ষে বিদ্যুৎ বর্ষণ করে বলল,—তোর বর কি এতই সুন্দর যে বিশ্বশুদ্ধ লোক দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে?

আমি হেসে বললাম,—তোর যখন বর হবে, তখন তুইও তাকে সুন্দর দেখবি—

—আমার বরই হবে না, তার সুন্দর আর কালো!

আমার মনে হল, কথাগুলো বলবার সময় ইন্দিরার গলাটা একটু কাঁপল, চোখে ঈষৎ বিষাদের ছায়া পড়ল। কিন্তু সে হয়ত আমারই কল্পনা।

তার মনের ভাবটা ভাল করে বোঝবার জন্ত বললাম,—আমাদের নামে মস্ত একটা অভিযোগ যে, আমরা শিক্ষিতা মেয়েরা নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিলাস নিয়েই ব্যস্ত, দুঃখকষ্ট দারিদ্র্যের কল্পনা করতেও আমরা শিউরে উঠি। তাই আমরা বিয়ে করতে চাইনে, একটা সংসার গড়ে তোলবার দায়িত্ব মাথায় নিতে আমরা প্রস্তুত নই। তোর ভাব দেখে লোকে মনে করবে, অভিযোগটা একেবারে মিথ্যা নয়।

ইন্দিরা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল,—সংসার গড়ে তোলবার দায়িত্ব মাথায় নিতে চায় না, এমন ছেলের সংখ্যাও তো কম নয়, বরং বেশী। মেয়েরা আছে বলেই এই দুঃখকষ্টের মধ্যেও সংসার চলছে, নইলে একদিনও চলত না। যারা মেয়েদের নামে অভিযোগ করে, তারা ভাবে না, কি গভীর মমতায় মেয়েরা এই সংসার আঁকড়ে ধরে আছে, কি অসীম ধৈর্য্যে হাসিমুখে তারা সব দুঃখ বরণ করে নিচ্ছে। কত আশঙ্কা উদ্বেগে তাদের বুক দুরু দুরু কাঁপছে,—ঝড়ের ঝাপটায় হাতের প্রদীপ নিবে যাচ্ছে, তবু তাদের মুখের হাসি কখনও মলিন হয় না। জীবনসংগ্রামের ভয়ে ছেলেরা যায় ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে, আর মেয়েরা রাখে সেই ঘর আগলে।

হেসে বললাম,—তোর ভাষার জোর আছে বটে; কিন্তু বর্ণনাটা সেকেলে মেয়েদের পক্ষে খাটে, আধুনিকারা ও-দাবী করতে পারে না!

ইন্দিরা উত্তেজিতভাবে বলল,—আধুনিক মেয়েদের দোষ, তারা

সহজে ধরা দিতে চায় না, শৃঙ্খল পরবার আগে বুঝতে চায়, যার কাছে ধরা দিচ্ছে তাকে বিশ্বাস করতে পারবে কি না। এযে অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ, অজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে দুঃসাহসে ভর ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়া!

আমি কোন উত্তর দিলাম না, ইন্দিরার কথাগুলো আমার মনের উপর প্রবল বেগে আঘাত করল।

সত্যই তো,—অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ, অজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া!···

ইন্দিরা বিকালে চলে গেল, কিন্তু তার কথাগুলো আমি ভুলতে পারলাম না—থেকে থেকে কেবল ঐ কথাই মনে আসছিল, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার বুক কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছিল!

একটু নির্জ্জনে বাইরের বাগানের মধ্যে গিয়ে বসলাম, সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছিল, তৃতীয়ার চাঁদ নবজাত শিশুর মতই আকাশের এক কোণে উঁকি দিচ্ছিল। যুঁই ফুলের গন্ধ মেখে বাতাস উতলা, পাখীরা গাছের মাথায় বসে কলরবে মগ্ন, সারা দিনের বিচ্ছেদের পর সেই বুঝি তাদের আনন্দমিলন। এই আনন্দের রাজ্যে কিসের আশঙ্কা, কিসের উদ্বেগ!···সমস্ত আকাশ বাতাস জুড়ে মিলনের রাগিণী বাজছে, অনাগত উৎসবের কোলাহলে রাজপথ মুখর হয়ে উঠেছে। সহসা আমার মনের দ্বার কোন অজ্ঞাতজগতের সামনে খুলে গেল। এ মিলন, এ উৎসব, এ তো

শুধু এ জন্মের নয়,—জন্মজন্মান্তর থেকে আমাদের এই মিলনের উৎসব চলে আসছে, সৃষ্টির অনন্তপ্রবাহে সে আর আমি দুজনে ভেসে চলেছি। যুগে যুগে কত পরিবর্ত্তন ঘটেছে, কত পাহাড় ভেঙ্গে সমতল হয়ে গেছে, কত নদী বালির চরে শুকিয়ে গেছে—আমরা দুজনে কত নব নব রূপবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে এসেছি,—কিন্তু আমাদের সেই প্রেম অক্ষয় অমর হয়ে আছে, তার কোন রূপান্তর হয় নি!

—শীলা—

কার কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠলাম, আমার আবেশ ভেঙ্গে গেল, স্বপ্নজগৎ শূন্যে মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে প্রথমে কাউকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু ভাল করে চেয়ে দেখলাম, কে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

আমার মনে একটু ভয়ই হল, কে এই অপরিচিত ব্যক্তি বাগানের ভিতর চোরের মত এসে আমাকে ডাকছে! মূর্ত্তি আর একটু অগ্রসর হয়ে বলল,—আমি এসেছি শীলা—

এ যে বিমান! এতক্ষণে চিনতে পারলাম। কিন্তু ওর গলার স্বর অমন অস্বাভাবিক, বিকৃত কেন? এমন দ্বিধাসঙ্কুচিত ভাবই বা কেন? কি হয়েছে ওর?

বললাম,—এদিকে এস, এ কদিন দেখিনি কেন?

বিমান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,—তোমার কাছে যাবার অধিকার আমি হারিয়েছি,—সেই কথাই আজ জানাতে এলাম।

তার স্বর কান্নার মত শোনাতে লাগল।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। কি বলতে চায় সে? আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপতে লাগল।

বিমান একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বেদনাজড়িত স্বরে বলল,—সব কথা বলবার নয়, বলতে তোমাকে পারবও না। শুধু এইটুকু বলে যাই, তোমার সঙ্গে আমার যে বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, তা আজ থেকে শেষ হয়ে গেল। আমি তোমার যোগ্য নই—নরাধম ভণ্ড প্রতারক আমি!

আমার মাথা ঘুরতে লাগল, চোখের সম্মুখে সমস্ত বিশ্বের আলো নিবে গেল! ইচ্ছা হল, চীৎকার ক'রে উঠি, কিন্তু কে যেন আমার কণ্ঠরোধ করল। আমি মূর্চ্ছিতবৎ সেই আসনেই লুটিয়ে পড়লাম।··

কতক্ষণ পরে জ্ঞান হ'লে চেয়ে দেখলাম,—বিমান সেখানে নাই!

*

* *

ধরণী দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি,—কি নিদারুণ লজ্জা, অপমানেই যে সীতা এ প্রার্থনা করেছিলেন, আমি আজ তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে পারছি। এর চেয়ে লজ্জা, অপমান নারীর আর কি হতে পারে? সেকালে তুষানলে পুড়িয়ে মারত। জানি না কেমন তার যন্ত্রণা,—কিন্তু এর চেয়ে সে যন্ত্রণা বোধ হয় বেশী নয়!

পুরুষই নারীর মন জয় করবার জন্য সাধনা ক'রে থাকে, আর আমি নারীর সমস্ত শীলতা বিসর্জ্জন দিয়ে তার কাছে ভালবাসা ভিক্ষা করতে গিয়েছিলাম,—মনের আবরণ উন্মোচন করে, সমস্ত দৈন্য তার কাছে তুলে ধরেছিলাম! সে যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এই আমার যোগ্য শাস্তি; ভিক্ষুককে কে কবে সম্মান ক'রে তার ভালবাসার মর্য্যাদা দেয়? আপমান ও লাঞ্ছনাই তার উপযুক্ত পুরস্কার!

সবই কি মিথ্যা, ক্ষণিকের মোহ, মায়া? কিন্তু জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে তাকেই যে আমি ভালবেসেছি, তাকেই কেন্দ্র ক'রে আমার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা, কৈশোরের সুখস্বপ্ন, যৌবনের পূজার অর্ঘ্য,

সে সবের কি কোন মূল্য নেই? তার যে স্নেহের স্পর্শে আমার জীবন মাধুর্য্যে ভরে উঠেছে, সে কি শুধু ভুল, আমারই মনের অসাড় কল্পনা?

আজ এক একটী করে মনে পড়ছে, কতদিন কত মুহূর্ত্তের কথা। মেয়েরা শিবপূজা করে, মনোমত বর লাভ করবার জন্য। আমিও যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ওকেই চেয়েছিলাম, আর কারু কথা কোনদিন কল্পনায়ও স্থান পায়নি! ওর হৃদয় কি তাতে একটুও সাড়া দেয়নি, পাষাণের মত তাতে একটীও রেখা পড়েনি, আমার হৃদয়ের ভাষা ও কি কখনও বুঝতে পারেনি?

দূর হোক ছাই! মিথ্যাই যদি সব, মায়াই যদি সব, তবে তাকে বিস্মৃতের গর্ভেই বিসর্জ্জন দিতে হবে! আমি যে তাকে কোনদিন ভালবেসেছিলাম, সে যে আমার জীবনে প্রভাতসূর্য্যের মত আবির্ভূত হয়েছিল, এ সবই দুঃস্বপ্নের মত ভুলে যেতে হবে!...

কিন্তু ভুলতে চাইলেই তো ভোলা যায় না। আমার হৃদয়ের পরতে পরতে, মর্ম্মের কোষে কোষে, তারই ছবি যে আঁকা আছে,—শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহের মধ্যে কস্তুরীর মত তারই স্মৃতির সুগন্ধ যে মিশে রয়েছে। ভুলতে হলে আমার সমস্ত হৃদয়কেই বিসর্জ্জন দিতে হবে, আমার আমিত্বকে ভুলে যেতে হবে।

তবু ভুলতে হবে,—বাল্যের কৈশোরের যৌবনের শীলাকে বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে দিয়ে নূতন শীলার জন্ম হবে। সে শীলা সুখদুঃখের অনুভূতিহীন, নির্ম্মম উদাসীন পাষাণী শীলা। জগতে কেউ তাকে চায় না, সেও কাউকে চায় না।

সেই ভাল—সেই ভাল!...

কতক্ষণ অর্দ্ধমূর্চ্ছিতবৎ মেজেতে পড়ে এই সব ছাইভস্ম ভাবছিলাম জানি না,—পিতার স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বরে চেতনা হল।

—একি তুই এখনও কাপড় জামা ছাড়িস্‌নি? শরীর কি ভাল নেই? কোথায় গিয়েছিলি?

ব্যস্তভাবে উঠে বসলাম। ছি ছি, কি স্বার্থপর আমি! নিজের দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে বাবার কথা ভুলেই গিয়েছি। তাঁর অজস্র প্রশ্নবাণ সুকৌশলে এড়িয়ে বললাম,—তুমি পড়বার ঘরে গিয়ে বস বাবা,— আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।

—না, না, তোকে অত ব্যস্ত হতে হবে না! তেমন কিছু দেরী হয়নি, এইত সবে নটা বাজল।

একমাত্র মেয়ে আমি,—ছেলের মত যত্নেই বাবা আমাকে মানুষ করেছেন। তাঁর যতকিছু যুক্তিপরামর্শ ছিল আমারই সঙ্গে। আমি না হলে তাঁর একদণ্ড চলত না, আমার হাতের সেবা না পেলে মন উঠত না।

সন্ধ্যার পর বাবাকে কোন ভাল বই পড়ে শোনানো আমার একটা নিত্যকাজের মধ্যে। কোন অনিবার্য্য কারণে একাজটুকু যদি বাদ পড়ত, তবে তিনি শান্তি পেতেন না, আমারও মন তৃপ্ত হত না। অন্য কারুর উপরেই বাবা এ কাজের ভার দিতে রাজীও হতেন না।

আমার এ নিদারুণ লজ্জা বাবা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন! না, তা কিছুতেই জানতে দেব না,—কঠিনশাসনে হৃদয়কে বাঁধতে হবে।···অন্যদিনের মতই সহজভাবে বাবার পড়ার ঘরে গিয়ে বসলাম।

বাল্মীকির রামায়ণ পড়ছিলাম। অশোকবনে সীতা। তপস্যায়

শীর্ণদেহা, রামবিরহকাতরা, একবস্ত্রা, একবেণীবদ্ধা। অনন্যচিত্তে কেবল রামকেই ধ্যান করছেন। লঙ্কার ঐশ্বর্য্য, রাক্ষসরাজের প্রলোভন, চেড়ীদের লাঞ্ছনাগঞ্জনা—কিছুই তাঁর চিত্ত বিচলিত করতে পারেনি। এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ তাঁর মুখে উদ্ভাসিত—মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎরেখার মত, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিশিখার মত, রুদ্রের ললাটবহ্নির মত। সমস্ত বন্ধন ও পীড়ন তুচ্ছ করে তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

সহসা অমঙ্গলরূপী ধূমকেতুর মত অশোকবনে রাক্ষসরাজ রাবণের আবির্ভাব। তার হাতে আজ শাণিত খড়্গ ঝলসিত, ভয়ঙ্কর তার রূপ, দশমুণ্ড কুড়িহাতে যেন ধ্বংসের বিভীষিকা জেগে উঠেছে। সীতাকে লক্ষ্য করে সে বলল,—সীতা, সেই ভিখারী রামের চিন্তা ত্যাগ করে, তুমি আমাকেই ভজনা কর। রাজ্যহারা, বনবাসী, ভিক্ষামাত্রসম্বল সেই রাম তোমাকে উদ্ধার করবে, এ নিতান্ত বাতুলের কল্পনা। দুস্তর ওই সমুদ্র, দুর্ভেদ্য এই লঙ্কাপুরী—সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত, দেবতাদেরও অজেয়। সামান্য মানব রামের সাধ্য কি, এর ত্রিসীমানায় প্রবেশ করে! তুমি একবার আমার বশ্যতা স্বীকার কর,—এই স্বর্ণলঙ্কার বিপুল ঐশ্বর্য্য, সসাগরা ধরণীর সমস্ত ধনরত্ন তোমার পদতলে লুটিয়ে পড়বে, শত শত দাস দাসী তোমার ইঙ্গিত মাত্রের অপেক্ষা করবে,—স্বয়ং দেবরাজমহিষী শচী এসে তোমার পদসেবা করবে।...

সীতা প্রশান্তকণ্ঠে বললেন,—রাক্ষসরাজ, তুচ্ছ তোমার এই স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্য্য, সসাগরা পৃথিবীর ধনরত্ন, অগণিত দাসদাসী,—এ সব সেই ভিখারী রামের পদনখরের যোগ্যও নয়। আমাকে বৃথা প্রলোভন দেখিয়ে নিজের পাপের ভার আর বাড়িয়ো না—

আশাহত রাবণ ক্রুদ্ধ আক্রোশে গর্জ্জন করে উঠল, তার হাতে উদ্যত খড়্গ বাড়বাগ্নির মত জ্বলতে লাগল,—সমস্ত চরাচর হাহাকার করে উঠল। অন্তরীক্ষে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর শ্বাসরোধ করে রইল···

বাবা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ভাবগদগদ স্বরে বললেন,—সার্থক মহর্ষির লেখনী, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে, মানবের চিন্তারাজ্যে এই মহান্ চরিত্রের তুলনা নেই। এই একনিষ্ঠ প্রেম, অপূর্ব্ব পাতিব্রত্য চিরদিন যে নরনারীর আদর্শ হয়ে থাকবে, এ আর আশ্চর্য্য কি?

আমি ধীরে ধীরে বললাম,—যদি রাগ না কর বাবা, একটা কথা বলতে চাই।

বাবা সস্নেহে হেসে বললেন,—কি বলতে চাস্ তুই?

—সীতার এই একনিষ্ঠতার পুরস্কার রাম দিয়েছিলেন—তাঁকে বনবাসে পাঠিয়ে; আর অগ্নিপরীক্ষায় আহ্বান করে, বনবাসে দিয়ে, সেই আদর্শ পাতিব্রত্যের গৌরব ঘোষণা করেছিলেন!

আমার শ্লেষোক্তি শুনে বাবা একটু আহত হলেন। কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে বললেন,—বাইরের দিক থেকে তা মনে হতে পারে বটে। কিন্তু রামের যে অন্তর্গূঢ় বেদনা, মর্ম্মদাহী জ্বালা—তা কে বুঝবে! একদিকে লক্ষলক্ষ প্রজা, রাজধর্ম্ম,—অন্যদিকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় সীতা,—কি নিদারুণ জটীল সমস্যা! একনিষ্ঠতার কথা বলছিস্,—স্বর্ণসীতা কি সেই একনিষ্ঠতারই প্রতীক নয়? সীতাকে বনে পাঠিয়ে রাম কি নিজের হৃৎপিণ্ডই ছিঁড়ে ফেলেন নি?

এর কোন উত্তর সহসা আমি খুঁজে পেলাম না। এই একনিষ্ঠ প্রেম, অক্ষয় পাতিব্রত্য চিরদিন আর্য্যভারতে আদর্শরূপে কীর্ত্তিত হয়ে

আসছে বটে! তবু মনে সংশয় হল,—এও কি একটা দৌর্ব্বল্য, কুসংস্কার নয়? রামসীতার কাহিনী ঘুমপাড়ানো গানের মতই যুগ যুগ ধরে এদেশের নরনারীর চিত্ত কি মোহাচ্ছন্ন করে রাখেনি, তাদের স্বাধীন চিন্তাকে সঙ্কুচিত করে নি? কে আমার এ প্রশ্নের উত্তর দেবে?

বাবার কথায় চমক ভাঙ্গল!

—তোর মা বলছিলেন, বিমানকে এর মধ্যে একদিন নিমন্ত্রণ করবার জন্য। দুই চার জন বন্ধু বান্ধবকেও ডাকতে হবে—

আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম,—এখন থাক না, বাবা—

আমার কণ্ঠস্বর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বোধহয় একটু বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। বাবা আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন,—সে দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে আমি মুখ নত করলাম।

—কেন, একথা বলছিস যে?

—লোকজনের গোলমাল আমার ভাল লাগে না, বাবা—

বাবা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—তবে থাক, তোর অমতে আমি কিছু করতে চাই নে।

আমি কোন মতে সেখান থেকে উঠে এলাম। কিন্তু মার হাত থেকে এত সহজে নিষ্কৃতি পেলাম না। খাওয়ার সময় মা বললেন,

—বিমান তোকে কিছু বলেছিল আজ?

আমি মৃদুস্বরে বললাম,—না—

মার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেন নি। একটা যে কিছু গোলমাল ঘটেছে,—এ ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছে।

কিন্তু আমার এ লজ্জার কথা কি ক'রে বাবা-মাকে নিজমুখে বলব? ওঁরা তা হলে মর্ম্মাহত হবেন, ওঁদের মেয়েকে কেউ যে এমনভাবে অপমান করেছে, প্রাণ থাকতে তা' সহ্য করতে পারবেন না। আমার জীবনের এই কলঙ্ক মলিন অধ্যায় সংগোপনেই থাক, অন্য কারুমুখে এ দুঃসংবাদ পেতে ওঁদের বিলম্ব হবে না।

আমার অনুমান যে মিথ্যা নয়, পরদিনই বুঝতে পারলাম। মার ঘরে, বাবা ও মা দু'জনে খুব উত্তেজিতভাবে কথা বলছিলেন। দরজা ভেজানো ছিল। গোপনে আড়িপেতে কথা শোনাটা আমি খুব হীনতা ব'লে মনে করি, তবু আজ কৌতূহল দমন করতে পারলাম না, মনে হল, এর সঙ্গে আমারই ভাগ্যসূত্র জড়িত।

বাবা বলছিলেন,—অপমানে আমার মাথা কাটা গেল, লক্ষ্মীপুরের জমিদার বংশকে কেউ কোনদিন এমন অপমান করতে সাহস পায় নি। সে দিনকার ছোকরা,—যাকে আমি হাতে করে মানুষ করলাম, যার বাপকে ছোট ভায়ের মত দেখতাম,—সে-ই কিনা আমারই বুকে ছুরি বসাল। এ যন্ত্রণা অসহ্য! আজ থেকে আমি ওর মুখ দর্শন করব না, ওর নাম পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে উচ্চারণ করতে দেব না। আমার মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের কল্পনা যে করেছিলাম, এ কথা সকলে ভুলে যাও!

মা একটু নরম সুরে বললেন,—ছেলেমানুষ কি বলতে কি বলেছে, আজকালকার ছেলেমেয়েদের তো আর খেয়ালের অন্ত নেই! দুদিন পরেই হয়ত নিজের ভুল বুঝতে পারবে। আমি না হয় ওকে একবার ডেকে পাঠাই, ছোট বৌকে খবর দিই—

বালির বাঁধ

বাবা গর্জ্জন ক'রে বললেন,—খবরদার, এসব তোমাকে কিছুই করতে হবে না। এখন যদি ও পায়ে ধরে এসে সাধে, তবু আমার মেয়ে ওর হাতে দেব না। আমি ওর চেয়ে শতগুণে ভাল ছেলে খুঁজে এই মাসের মধ্যেই শীলার বিয়ে দেব, নইলে আমি চৌধুরীবংশের সন্তান নই!

বাবা খুবই অমায়িক, সরলপ্রকৃতি, স্নেহ দয়া দিয়ে গড়া তাঁর কোমল মন। কিন্তু তাঁর বংশের মর্য্যাদায় যদি কেউ আঘাত দিত, তবে তাঁর জ্ঞান থাকত না,—ক্রুদ্ধসিংহের মত সম্পূর্ণ ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করতেন। স্বাভাবিক অবস্থায় বাঙ্গলার দুর্দ্দান্তপ্রকৃতির জমিদারদের মত তাঁর কড়া মেজাজ ছিল না;—কিন্তু তাঁর সঙ্কল্পে যদি কেউ বাধা দিত, তাঁকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করত, তবে আর রক্ষা থাকত না,—পূর্ব্ব-পুরুষের যে বিদ্রোহের বীজ তাঁর রক্তে সুপ্ত ছিল, তারা সব মাথা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠত।

সন্ধ্যাবেলা লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে দেখলাম, বাবা গুম হয়ে বসে আছেন। একদিনের মধ্যেই তাঁর চেহারা বদলে গেছে। তাঁর চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন, ললাটে চিন্তার রেখা। আমাকে দেখে বললেন,

—তোমারই প্রতীক্ষা করছিলাম,—বস এখানে।

আমি কাঠগড়ার আসামীর মত কম্পিতহৃদয়ে বাবার সম্মুখে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম।

—তুমি আমার বুদ্ধিমতী মেয়ে, লেখাপড়া শিখেছ। তোমার কাছে আমি মনের বল, আত্মমর্য্যাদাবোধ প্রত্যাশা করি। আমি জানি, বিমানকে তুমি ভালবাস, তার সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি খুব সুখী হতে, আমিও কম সুখী হতাম না। কিন্তু তাকে যা মনে করেছিলাম, সে তা

নয়। আমরা বালির উপর প্রাসাদ গড়তে চেয়েছিলাম। তোমাকে—কেবল তোমাকে নয়, তোমার পিতৃকুলকে সে যে অপমান করেছে, তার ক্ষমা নেই, প্রায়শ্চিত্ত নেই। আমি চাই, তুমি তার স্মৃতি মন থেকে একেবারে মুছে ফেলবে, তার নাম পর্য্যন্ত কোনদিন মুখে আনবে না—

দুইহাতে মুখ ঢেকে টেবিলের উপর মাথা গুঁজে আমি বসে রইলাম। আমার হৃদয়ে যে প্রবল ঝড় বইছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করবার সাধ্য ছিল না। এ অমোঘ দণ্ড আমাকে বুকপেতে নিতেই হবে, কিন্তু তার আঘাতে আমার হৃদয় যে শতখণ্ডে চূর্ণ হয়ে যাবে!······

গৃহমধ্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা,—প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হচ্ছিল এখনি একটা কিছু অঘটন ঘটবে।

বাবা কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে বললেন,—তুমি তো নিতান্ত ছেলেমানুষ নও মা, সবই বুঝতে পার। আমার ইচ্ছা তোমার বিয়েটা শীগ্‌গিরই দিয়ে ফেলি, নইলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব না।

আর্ত্তকণ্ঠে বললাম—বাবা!

বাবা একটু থেমে বললেন,—নির্ম্মল ছেলেটী ভাল, বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছে, বংশও ভাল। তা ছাড়া মনে হয়, তোমাকে বিয়ে করবার জন্য ওর খুব আগ্রহও আছে—

আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে এল—অসাড় নিস্পন্দের মত আমি বসে রইলাম।

বাবা কিছুক্ষণ আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন,—তোমার তা'হলে অমত নেই, আমি এদের সঙ্গেই কথা পাকা করি—

একবার ইচ্ছা হল, চীৎকার করে বলি,—বাবা আমার ঘোর অমত, এ বিয়ে আমি কিছুতেই করতে পারব না। কিন্তু একটা প্রবলশক্তি যেন আমার কণ্ঠরোধ করে রইল। মাথার উপরে যার খড়্গ উদ্যত, সেও বোধহয় এমনি ভয়ে শব্দ করতে পারে না।

আমি কোনরূপে ছুটে পালিয়ে এলাম। নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলাম। যে অশ্রুর বন্যা এতক্ষণ জোর করে রোধ করেছিলাম, সে আর শাসন মানল না।···

ভগবান কি অপরাধ করেছি আমি তোমার কাছে! জীবনে যদি সুখের স্বপ্নই ভেঙ্গে দিলে, আবার এক নূতন সর্ব্বনাশের পথে কেন আমাকে ঠেলে দিচ্ছ। এতো আমি পারব না—কিছুতেই পারব না! বিমান আমাকে নিষ্ঠুরের মত ত্যাগ করতে পারে,—কিন্তু আমি যে তাকেই মনে মনে বরণ করেছি, আকৈশোর তাকেই ধ্যান করেছি। অন্যের পত্নী হয়ে কেমন করে আমি নিজেকে কলুষিত করব, আর একজনের জীবন বিষময় করে তুলব,—তার সুখের সংসার অভিশাপে দগ্ধ করব! না—না—সে কিছুতেই হতে পারে না!

অনেক বেলায় মা এসে বললেন,—একি, এমন করে মেজেতে পড়ে আছিস কেন মা? অসুখ করবে যে। ওঠ্, স্নান করবি চল।

আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম, কোন কথা বলতে পারালাম না।

মা পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন,—সেই স্নেহের স্পর্শে আমার শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। হায়, এই স্নেহের মধ্যেই যদি চিরকাল ডুবে থাকতে পারতাম!

কিছুক্ষণ পরে ব্যথিতস্বরে তিনি বললেন,—সবই বুঝতে পারছি মা,—আমারও মনে আঘাত কম লাগেনি—এযে আমার জীবনের সব চেয়ে বড় সাধ ছিল!...কিন্তু ওঁর মনের অবস্থাও তো বুঝতে পারছি, এত বড় অপমান উনি কি করে সইবেন?

আমি আর্ত্তকণ্ঠে বললাম,—মা, তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বল,—বিয়েতে আমার কাজ নেই, আমি চিরজীবন কুমারী হয়েই থাকব। একটা মেয়েকে তোমরা কি আর খেতে দিতে পারবে না, তোমাদের তো অভাব নেই!

মা স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে বললেন,—পাগলী কোথাকার, কি যে বলে তার ঠিক নেই—সবই তো তোর!...কিন্তু ওঁকে তো তুই জানিস্—একবার যে জিদ চাপে, প্রাণ গেলেও তা ছাড়তে চান না। নির্ম্মলের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবেন, এই হয়েছে ওঁর সঙ্কল্প,—নইলে অপমানের জ্বালা উনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বললাম—তা হলে কি হবে মা!

আমি একবার শেষ দেখি,—বিমানকে নিজে ডেকে পাঠাই—

—না—না, তা করে কাজ নেই মা, সে বড় লজ্জার কথা, তোমার অপমান আমি সইতে পারব না!

মা কিছুক্ষণ নীরবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

—তবে আর অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই, মা! হিন্দুর মেয়ে তুই, নারায়ণ আর অগ্নি সাক্ষী করে যার গলায় মালা দিবি, সেই হবে তোর দেবতা। আমরা যে ছেলেবেলা থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছিলাম—

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন অসাড় হয়ে গেল, মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করতে লাগল, মূর্চ্ছাহতের মত মার কোলে মাথা গুঁজে আমি পড়ে রইলাম।...

*

* *

কিন্তু মার অনুরোধ উপরোধ, কাতর মিনতি, আমার মৌন প্রতিবাদ কিছুতেই বাবার সঙ্কল্প টল্‌ল না। নির্ম্মল বোধ হয় আভাসে ইঙ্গিতে কথাটা জানতে পেরেছিল, সেও বাবার কাছে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করল। তার সঙ্গে দেখা হবার ভয়ে আমি গৃহকোণে আশ্রয় নিলাম, বাইরে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলাম।

অবশেষে আমার অগ্নিপরীক্ষার দিন এল। বাবা নির্ম্মলকে একদিন নিমন্ত্রণ করলেন। আমাকে ডেকে বললেন,—বুড়ো হয়ে পড়েছি মা, শরীরে আর কুলায় না, তুই-ই আমার হয়ে নির্ম্মলকে অভ্যর্থনা কর, দেখিস যেন কোন নিন্দা না হয়।

বাবা যে এই ভাবে আমাকে কঠিন শাস্তি দেবেন, তা আমি ভাবিনি। এর চেয়ে আমাকে যদি অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিতেন,—সেও বোধ হয় ভাল হত!

অগত্যা আমিই নির্ম্মলকে অভ্যর্থনা করলাম। সৌজন্য, বিনয়, শিষ্টাচার যেটুকু শিখেছিলাম, আমার ব্যবহারে কিছুরই ত্রুটী হল না।

কিন্তু সে সবই যেন যন্ত্রবৎ আমি করে যাচ্ছিলাম, তার মধ্যে না ছিল প্রাণ, না ছিল অন্তরের আনন্দ। ছায়াচিত্রের অভিনেত্রীরা যেমন করে অভিনয় করে, তার মধ্যে না থাকে তাদের হৃদয়ের স্পর্শ, বেদনাবোধ, এও বুঝি ঠিক তেমনই। আমার মনে হচ্ছিল,—এ আমি নয়, আর কেউ আমার দেহ অধিকার ক'রে এই সব অভিনয় করছে, আমি শুধু দূর থেকে দর্শকের মত দাঁড়িয়ে দেখছি। এই প্রাণহীন অভিনয়ের বিরুদ্ধে আমার হৃদয় এক একবার বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইছিল, কিন্তু তখনই কঠিন শাসনে তাকে নিরস্ত করছিলাম।

বাবা আমার ভাব দেখে বোধ হয় খুসী হয়েছিলেন, দূর থেকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখছিলেন। কিন্তু নির্ম্মলের চোখকে ফাঁকি দিতে পারি নি। আমার বাহ্য বিনয় ও শিষ্টাচার তার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল,—পাষাণপ্রতিমার মধ্যে যে প্রাণ নেই, এ সে স্পষ্টই অনুভব করতে পারছিল। তার মুখের বিষণ্ণকরুণ ভাব, নৈরাশ্যব্যঞ্জক বেদনাতুর দৃষ্টির মধ্য দিয়েই আমি তার পরিচয় পাচ্ছিলাম।

নির্ম্মল লোকটা মন্দ নয়। আর পাঁচজন বিলাত ফেরত যুবক যেমন হয়ে থাকে তেমনি। একটু অহঙ্কার আছে, নিজের বিদ্যা বুদ্ধি সম্বন্ধে খানিকটা ভ্রান্তধারণা আছে। দেশের সাধারণ লোকদের চেয়ে সে যে স্বতন্ত্র শ্রেণীর জীব, এমন একটা ভাবও আছে। কিন্তু যে কারণেই হোক, আমার উপর তার যে একটা আকর্ষণ হয়েছে, এ আমি বুঝতে পারি। আমাকে খুসী করবার জন্য প্রবল আগ্রহ সে গোপন করতে পারে না, আজ সেটা খুব স্পষ্ট হয়েই উঠেছিল।

তার উপর সত্যিই আমার একটু মায়া হল। কিন্তু উপায় নেই, তাকে আমি ফাঁকি দিতে পারব না, নিজেকেও প্রতারণা করতে পারব না। আমি জানি, নির্ম্মলের মত স্বামী পেলে অনেক মেয়েই ধন্য হত, সংসার পেতে সুখী হতে পারত। কিন্তু আমি তো সে কৃত্রিম অভিনয় করতে পারব না, যার মধ্যে না আছে অনুরাগ, না আছে ভালবাসা,—সে বিয়ে যে, দুজনের কাছেই নির্ম্মম অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে!

আহারের পর বাবা নির্ম্মলের সঙ্গে দু'একটা কথা বলেই উঠে গেলেন, লাইব্রেরী ঘরে রইলাম কেবল নির্ম্মল আর আমি। বাবা যে ইচ্ছা ক'রেই এ যোগাযোগ ঘটিয়েছেন, এ আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। এমন বিপদে কোন দিন পড়িনি, আমার শরীর ঘেমে উঠেছিল, গলা বুক শুকিয়ে আসছিল।

একটা নির্ব্বাক মেয়ের কাছে এমনভাবে বসে থেকে নির্ম্মলও বিব্রত হয়ে উঠেছিল! বোধ হয় এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই সে ফুলদানী থেকে ফুল নিয়ে টেবিলের উপরে ছড়াতে লাগল, আবার গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেগুলি ফুলদানীতে সাজাতে লাগল। এমনি করে প্রায় পনর মিনিট কেটে গেল, যেন জগতে এর চেয়ে বড় কাজ কিছু আর ছিল না। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, একটা কিছু সে আমাকে বলতে চায়, কিন্তু প্রবল সঙ্কোচ এসে তার কণ্ঠরোধ করছিল।

অবশেষে জোর করে সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে হঠাৎ সে বলে উঠল,—আজকার সন্ধ্যায় এখানে যে আনন্দ পেলাম, জীবনে আর কোথাও

তা পাইনি। আপনার হাত দুটী যেমন শুভ্র সুন্দর, তার সেবা আর যত্নও তেমনি মনোহর—

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম,—সে আমার পরম সৌভাগ্য,—জানেন তো, হিন্দুর ঘরে অতিথি দেবতার চেয়েও বড়!

আমার কথার ভঙ্গীতে নির্ম্মল আহত হল, এ বোধ হয় সে প্রত্যাশা করেনি। একটু ইতস্ততঃ করে সে বলল,

—দেখুন, মিস্ চৌধুরী, নারীর কল্যাণহস্ত, তার প্রসন্নদৃষ্টি যে, মানুষের জীবনে কতবড় প্রয়োজন, সে আমি আজ প্রথম অনুভব করলাম!

আমি কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য বললাম,—আপনি তো অনেকদিন বিলাতে কাটিয়ে এলেন। আপনার মুখেই শুনেছি, সে দেশের মেয়েদের সঙ্গে এখানকার মেয়েদের তুলনাই হয় না,—তারা অকুণ্ঠ, স্বাধীন, তাদের কণ্ঠে মধু ঝরে। তাদের মধ্যে থেকেও কি কল্যাণ-হস্ত, প্রসন্নদৃষ্টির সাক্ষাৎ পান নি?

নির্ম্মল কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে উচ্ছ্বসিতভাবে বলল,—সত্যিই পাইনি, মিস্ চৌধুরী! তারা যেন সব টবের গাছে সাজানো গোলাপ, আর আপনারা বাগানের রজনীগন্ধা; তারা চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ-লেখা, আর আপনারা ঘর আলোকরা স্নিগ্ধ দীপশিখা!

আমি হেসে বললাম,—চমৎকার আইডিয়া, কবিতা লেখবার যোগ্য!

নির্ম্মলের মুখ মলিন হয়ে গেল, তাকে যে অনর্থক এমন করে আঘাত করলাম, সে জন্য আমার মনও ব্যথিত হয়ে উঠল। কিন্তু এই যে আমার আত্মরক্ষার অস্ত্র!

কিছুক্ষণ নীরব থেকে নির্ম্মল ধীরে ধীরে বলল,—আমি চাই, এই কল্যাণদীপ চিরদিনের জন্য আমার ঘর আলো করুক, রজনীগন্ধার স্নিগ্ধসৌরভে আমার জীবন সুন্দর মধুর হোক—

এই সেই পরম বিপদের মুহূর্ত্ত—এর জন্যই আমি সশঙ্কচিত্তে প্রতীক্ষা করছিলাম!……কি উত্তর দেব? স্পষ্ট করে বলব, স্বেচ্ছায় তাকে আমি স্বামীরূপে বরণ করতে পারব না? কিন্তু তাহলে যে বাবাকেই অপমান করা হবে, বাবা আর ওদের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন না। একেই তিনি যেমন অভিমানী! চুপ করে থাকলেও তো চলবে না, নির্ম্মল মনে করবে, আমি তার কথায় সম্মতি দিলাম—আমার হৃদয় সে জয় করতে পেরেছে। এত বড় মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিলে সে যে হবে আমার আত্মহত্যারই সামিল!…

অপাঙ্গে চেয়ে দেখলাম,—নির্ম্মলের উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল দৃষ্টি আমারই মুখের উপর নিবদ্ধ, তার সমস্ত প্রাণ যেন আমার একটা কথার উপর নির্ভর করছে!

অতি কষ্টে বললাম,—আমার নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই অস্বাভাবিক মনে হল—মিঃ নাগ, যে সম্মান আমাকে দিতে চাইছেন, আমি মোটেই তার যোগ্য নই, তা গ্রহণ করবার সাহসও আমার নাই! আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না—

আর কোন কথা বলবার শক্তি আমার ছিল না। নির্ম্মল কোন উত্তর দেবার আগেই আমি হঠাৎ উঠে চলে এলাম। ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সৌজন্য—এসব চিন্তা করবার সময় আমার ছিল না! একবার মনে হল, নির্ম্মল পিছন থেকে আমাকে ডাকছে, কিন্তু আমি আর ফিরে চাইলাম না।

পরদিন মার কাছে শুনলাম, বাবা বিয়ের দিন পাকা করে ফেলেছেন, তিন দিন পরেই আমার গায়ে হলুদ। কঠিন আমার দণ্ড! সেকালের কাজীরা যেমন একতরফা বিচার ক'রে হতভাগা আসামীদের শূলে চড়িয়ে দিত, কোন আপত্তি শুনত না—এও ঠিক তেমনই!

আমি একটা কথাও না বলে নিজের ঘরে এসে শয্যাগ্রহণ করলাম। সমস্ত দিনের আলো আমার চোখের সামনে মিলিয়ে গেল। সত্যই কি আমার জীবনে এমন একটা ভীষণ অভিনয় হবে? নির্ম্মলের কি চোখ নেই, অনুভূতির শক্তি নেই,—সে কি কিছুতেই বুঝতে পারল না যে, আমি তাকে চাইনে? একটা প্রাণহীন দেহ নিয়ে সে কি করবে?

আর বিমান এত নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন সে? এ কয়দিনের মধ্যে সে একবারও এ বাড়ীতে এল না, জানতে চাইল না,—তার নিক্ষিপ্ত বজ্রদণ্ডে আর এক জনের জীবন কেমন ক'রে পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

......কিন্তু সে হয়ত এ সব কিছুই কল্পনা করতে পারে নি, তারই হাতে-গড়া শীলাকে এরা সকলে মিলে যে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে, এ বোধ হয় তার ধারণার অতীত?

ক্ষণিকের বিস্মৃতিতে সে যাই মনে করুক, আমি জানি, সেই আমার স্বামী; এ বিপদে স্বামী ছাড়া, আর কার কাছে নারী নিজের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দাবী করবে! তাকেই আমি সব কথা খুলে বলব। নির্লজ্জতার চরম হবে, লোকে বেহায়া বলবে? বলুক,—যার সর্ব্বনাশ হতে বসেছে, এত সূক্ষ্ম মান অপমানের বিচার তার শোভা পায় না।

চিঠি লিখতে হাত আর সরে না। পাঁচ সাত খানা ছিঁড়ে, তিন চার ঘণ্টা চেষ্টা করে, অনেক কষ্টে অবশেষে একখানা চিঠি লিখলাম।

কি ছাইভস্ম লিখেছিলাম নিজেও তা বুঝতে পারিনি। শুধু এইটুকু মনে আছে, চিঠির শেষে ছিল—একটীবার তুমি আসবে, নইলে আমাকে আর এ জীবনে দেখতে পাবে না!

এই আহ্বানেও কি সে সাড়া দেবে না?...অভিমানে সে যাই বলুক, আমি যে তার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত জানি!

কিন্তু কই, সমস্ত দিন গেল, পশ্চিম আকাশের রক্তরাগ সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল—সে তো এল না! যদি সে আমার এই শেষ আহ্বানও প্রত্যাখ্যান করে, তবে তো আমার কালামুখ আরও কলঙ্ক-মলিন হবে,—নারীত্বের শেষ মর্য্যাদাটুকু ধূলায় লুটিয়ে পড়বে; ছি ছি, কেন আমি লজ্জার মাথা খেয়ে তাকে চিঠি লিখতে গেলাম, তাকে আসতে বললাম! অদৃষ্টে যা ছিল, তা-ই না হয় হ'ত, এমন করে যেচে অপমানের বোঝা মাথায় করতে হ'ত না!

সমস্ত রাতের মধ্যে একবারও চোখে ঘুম এল না, সামান্য শব্দে চমকে উঠতে লাগলাম, আবার নিজের কাছেই লজ্জা পেয়ে প্রাণপণে দুই চোখ বুজে ঘুমের আরাধনা করতে লাগলাম, শেষরাত্রে কখন একটু তন্দ্রা এসেছিল, স্বপ্নে দেখলাম,—বিমান জোরে ছুটে চলেছে, আমিও তার পিছনে পিছনে ছুটছি, কিন্তু ধরতে পারছি না। অবশেষে একটা বিশাল নদীর ধারে জাহাজঘাটায় গিয়ে দুজনে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, একখানা বড় জাহাজ যাত্রী নিয়ে ছাড়বার জন্য প্রস্তুত। লস্করেরা নোঙর তুলছে, সিঁড়ি ওঠাচ্ছে। বিমান আমার দিকে চেয়ে দুষ্টামির হাসি হেসে বলল,—'এইবার আমায় ধরত'! ব'লেই সে দ্রুতবেগে শেষ সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে গিয়ে উঠল, জাহাজ

অমনি বাঁশী বাজিয়ে ছেড়ে দিল। আমি ঘাটে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলাম!..

সকাল বেলা মা এসে বললেন,—এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুচ্ছিস্ কেন? সকাল সকাল স্নান করে নে, অনেক কাজ আছে। তোর ছোট মাসীর বাড়ী থেকে ওরা এখনই আসবে—

বলতে বলতে আমার মুখের দিকে চেয়ে উদ্বিগ্নভাবে বললেন,—চোখ মুখ যে কালো হয়ে গিয়েছে! কোন অসুখ করেনি তো?

আমি অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললাম,—না, কিন্তু তোমরা আমাকে বনবাসে পাঠিয়ো না মা, তাহলে আমি বাঁচব না!

—যতসব অলক্ষুণে কথা! আজবাদে কাল গায়ে হলুদ—মেয়ে বলছেন আমি বিয়ে ক'রব না! আদর দিয়ে দিয়ে উনি তোমার মাথাটা খেয়েছেন। তখনি বলেছিলাম—

কি যে তখন বলেছিলেন, তা অনুচ্চারিত রেখেই মা বিরক্তভাবে চলে গেলেন। হায়, মা হ'য়েও তুমি মেয়ের বেদনা বুঝতে পারলে না, এমনি আমার দুর্ভাগ্য!

সমস্তদিন যে কি যন্ত্রণায় কাটল, তা বলবার ভাষা নেই! এদিকে বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন কুটুম্বের ভীড় জমে উঠেছে, ছোট মাসীমার ছেলেমেয়েরা এসে কোলাহল বাড়িয়ে তুলেছে। দূর থেকে সবই শুনতে পাচ্ছি। অথচ যার জন্য এই উৎসবের কলরব, তার মনে নিরানন্দের অন্ধকার! ওসবের সঙ্গে আমার কোনই যোগ নেই—আমি

ওই মণ্ডলীর সম্পূর্ণ বাহিরে—নিজেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। ছোট মাসীমার মেয়ে বিভা আমারই প্রায় সমবয়সী, সবে বিয়ে হয়েছে। সে খুজে খুজে আমাকে আবিষ্কার করল। হাততালি দিয়ে বলল,—এই যে শীলা-দি, কি মেয়ে বাপু তুমি, খুজে খুজে একেবারে হয়রাণ! বিয়ে আমাদেরও হয়েছে, কিন্তু এমন গুমর করিনি। হলই বা ব্যারিষ্টার বর,—তা বলে এখন থেকেই আমাদের সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রবে না কি?

বলতে বলতে বিভা আমার পাশে খাটে বসে পড়ল।

আমি তার একখানি হাত ধ'রে ক্লান্তস্বরে বললাম,—তোর মত সকলের বিয়েই তো আর আনন্দের নয়!

বিভা আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকল, তারপর বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে বলল,—ও মা, সে কি কথা! বড় মেসো মশায় এইমাত্র মাকে বলছিলেন, তোমার মত নিয়েই বিয়ে হচ্ছে—

—আমাদের দেশের মেয়েরা কি মানুষ, যে তাদের মতামতের দরকার হবে?

বিভা কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে বসে রইল,—তারপর উঠে পড়ে বলল,—চললাম ভাই, শীলা-দি—এসব আমার ভাল লাগে না।

সমস্তদিন প্রতীক্ষার পর সেদিনও সূর্য্য ডুবে গেল, আমারও আশার আলোক নির্ব্বাপিত হল। ধরণী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল,——মনে হতে লাগল, যদি এই অন্ধকার চিরস্থায়ী হয়, যদি সকালে সূর্য্য আর না ওঠে! হে ভগবান, তাই কর, তাই কর, আমি যে আর দিনের আলোর মধ্যে বাঁচতে চাইনে!……

*

*　*

অন্ধকার ঘরেই এমনিভাবে কতক্ষণ পড়েছিলাম, জানিনা,—কিন্তু ঝি এসে আলো জ্বেলে দিয়ে বলল,—একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন দিদিমণি,—

চমকে উঠে বললাম,—কে—বিমান-দা ?

বিন্দু ঝির ঠোঁটের কোণে বুঝি ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠল।

—না গো না, একটী মেয়ে—

—মেয়ে ? আমার সঙ্গে দেখা করতে ? তোর ভুল হয় নি তো ?

—বুড়ো হয়েছি বলে কি এমনি ভুল হবে ! বলল,—তোমাদের দিদিমণির সঙ্গে দেখা করব।

—আচ্ছা আসতে বল।

বিন্দু চলে গেল। ভাবলাম, কলেজের কোন মেয়ে এসেছে।—কি বিপদেই পড়লাম !

রুদ্ধনিঃশ্বাসে আগন্তুকের অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরে যে ঘরে প্রবেশ করল, তাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সাদা

কাপড়-পরা তরুণী বিধবা, বয়স তেইশ চব্বিশ বৎসরের বেশী নয়। গায়ে একটা সাদা গরদের চাদর জড়ানো। অপূর্ব্ব সুন্দরী, চোখ দুটী ভোরের আকাশের শুকতারার মত উজ্জ্বল। মুখে শান্ত বিষাদের ছায়া,—কিন্তু তাতে তার সৌন্দর্য্য যেন আরও বেড়ে গিয়েছে। তার সমস্ত চেহারার মধ্যে একটা সম্ভ্রম ও আত্মমর্য্যাদার ভাব ফুটে উঠেছে। নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরের মেয়ে। কিন্তু কে এ? আমি তো কোন দিন একে দেখিনি!

অবাক হয়ে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে আগন্তুককে বসতে বলতেও ভুলে গিয়েছিলাম। মেয়েটী বোধহয় আমার মনের অবস্থা অনুমান করে, নিজেই সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল,

—আমাকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছেন নয়? আপনিই শীলা দেবী?

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম, হ্যাঁ, বসুন আপনি—

তরুণী ঈষৎ হেসে বলল,—আমার নাম প্রভা, হাসপাতালের নার্স, বিমান বাবু আমাকে জানেন।

আমার মনে হল, ওর ওই হাসির মধ্যে যেন বিদ্রূপের শাণিত তীর লুকানো আছে। কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে নয়,—সামান্য একজন নার্স!.. বুঝেছি বিমানই ওকে পাঠিয়েছি, আমাকে আরো বেশী অপমান করবার জন্য। আমার সমস্ত অন্তর ক্রোধে জ্বলে উঠল—কি আস্পর্দ্ধা!

রুক্ষস্বরে বললাম,—আমার কাছে কি দরকার আপনার?

প্রভা হাসিমুখেই বলল,—আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি,—যদি দয়া ক'রে আমার কথা শোনেন—

মনে ঘোর সন্দেহ হল, ওর মতলব কি? একটু বিরক্তভাবেই বললাম,—আমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছেন, আপনি? আপনার কথা ভাল বুঝতে পারছি নে—

—বিমান বাবু মানুষ নন, দেবতা। আমার জন্য তিনি যা করেছেন, সে-ঋণ আমি কোন দিন শোধ করতে পারব না। আমার স্বামী যখন মৃত্যুশয্যায়, তিনিই তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন—এক পয়সা ফি নেন নি। তারপর, এই নিরাশ্রয়, অনাথিনী বিধবাকে তিনিই সমস্ত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেছেন, তাঁর দয়াতেই বেঁচে আছি। এমন উদার মহৎ মন—

সন্দেহ ঘনীভূত হল, মন আরও তিক্ত হয়ে উঠল। শুষ্ককণ্ঠে বললাম,—বিমান বাবুর উপর আপনার যে এতখানি শ্রদ্ধা তা শুনে সুখী হলাম। কিন্তু এর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?

প্রভা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বলল,—সেই কথাই আজ বলতে এসেছি। আমি জানি, বিমান বাবুর উপর আপনার ভালবাসা অসীম, বিমান বাবুও আপনাকে খুব ভালবাসেন, আপনাদের দুজনের—

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। উত্তেজিত স্বরে বললাম,—এসব কি বলছেন আপনি? আমাকে কি বাড়ী বয়ে অপমান করতে এসেছেন?

প্রভার মুখ রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে গেল, বিমূঢ়ের মত সে আমার দিকে চেয়ে রইল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে।

হঠাৎ সে আমার কাছে ছুটে এসে আমার দুহাত জড়িয়ে ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল,

—আমাকে বিশ্বাস কর বোন, আমি তোমাকে অপমান করতে আসিনি, তোমার পায়ের কাঁটা বুক দিয়ে তুলে নিতেই এসেছি!

অদ্ভুত এই নারী! এ কি অভিনয়, না, সত্যিকার ব্যাকুলতা? কি চায় ও আমার কাছে! তার বিষণ্ণ মলিন মুখ, সজল চক্ষু, সকাতর ভাব দেখে, আমার মন আর্দ্র হয়ে এল। হয়ত আমিই ভুল বুঝেছি, ওর উপর অনর্থক রূঢ় আচরণ করেছি। একজন ডাক্তার কোন গরীব নার্সকে সাহায্য করবে, এতো স্বাভাবিক। ওর হয়ত এখনও বিশ্বাস, আমিই বিমানের ভাবী বধূ,—তাই আমার কাছে কোন প্রার্থনা জানাতে চায়। কিন্তু হায়, ওতো জানে না—

নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার পাঁজর ভেদ করে বের হয়ে এল।

আমার ভাব দেখে সাহস সঞ্চয় করে প্রভা বলল,

—নারী না হলে নারীর মনের বেদনা কেউ বুঝতে পারে না।··· আমি সব জানি,—বিমান বাবু আর তোমার মিলনের পথে আমিই একমাত্র বাধা—আমার জন্যই তিনি তোমাকে বিয়ে করতে চান নি—

আমি দুই হাতে মুখ ঢেকে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠলাম—ওঃ!

প্রভা ধীরে ধীরে বলল,—রাগ করো না বোন, যে কালসাপিনী দংশন করে, সেই আবার বিষ তুলে নেয়!

আশ্চর্য্য এই নারীর ধৃষ্টতা! অসহ্য ক্রোধে বললাম,

—তুমি আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও! নির্লজ্জ বেহায়া,—নিজের মুখে নিজের কলঙ্ক প্রচার করতে জিব একটুও আড়ষ্ট হল না!

ভেবেছিলাম, এই কঠিন আঘাতের পর ও আর এক মুহূর্ত্তও আমার সামনে থাকবে না,—কিন্তু আশ্চর্য্য, ওর মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, শান্ত অবিচলিত কণ্ঠেই সে বলল,

—আমার কথা তো শেষ হয়নি,—সব শুনে, নিজের হাতে তুমি কঠিন দণ্ড দিয়ো, আমি মাথা পেতে নেব!

একটু থেমে বিষাদখিন্ন কণ্ঠে সে বলল,—আমিই সম্পূর্ণ দোষী, তাঁর কোন দোষ নেই। এই নিরাশ্রয় অনাথিনী বিধবার উপকার করতে গিয়ে, লোকনিন্দা তাঁর হল অঙ্গের ভূষণ,—বন্ধুমহল কুৎসায় মুখর হয়ে উঠল, আমারও জীবন হল দুর্ব্বহ। কালসাপের দাঁতে বিষ আছে জানতাম, কিন্তু লোকের রসনায় যে তার চেয়েও তীব্র হলাহল, এ আমি প্রথম বুঝতে পারলাম। যারা একদিন আমার সর্ব্বনাশ করতে চেয়েছিল, তারাই এখন আমার অভিভাবক সেজে দাঁড়াল, আমার চরিত্রে কলঙ্কের ছাপ দিতেও তারা কুণ্ঠিত হল না—

বলতে বলতে প্রভার মুখ কালো হয়ে গেল, তার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। কিন্তু জোর করে এই দুর্ব্বলতা ঠেলে ফেলে সে আবার বলতে লাগল,

—অবশেষে উনি বললেন,—প্রভা তোমার ভার যখন নিয়েছি, তখন সে দায়িত্ব আমি কিছুতেই ত্যাগ করবনা, আইন ও সমাজের নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে আমিই তোমাকে রক্ষা করব। জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘের কথা শুনেছি। আমারও হল তাই। একদিকে জীবন-ব্যাপী কলঙ্কের বোঝা, অন্যদিকে দেবতাকে সিংহাসন থেকে টেনে নামানো···। দুর্ব্বল অসহায় নারী আমি—তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলাম!...

প্রভা হঠাৎ থামল। গৃহমধ্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা যেন শ্বাসরোধ করছিল, আমার মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছিল। প্রভা কার কথা বলছিল, কি বলছিল, তার খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু ছি ছি, আমি ওর কাছে ছোট হতে যাব কেন,—যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে, তার কাছে পরাজয় স্বীকার,—সে যে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর! জোর করে মনের রাশ টেনে ধরে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বললাম,

—তা হ'লে এই সুসংবাদটাই আমাকে তুমি জানাতে এসেছ? ভাবী সপত্নীর দাবী যাতে ছেড়ে দেই, এই ভিক্ষা তুমি চাও? বেশ তাই হবে—

প্রভা যেন মর্ম্মাহত হল, তার মুখে বেদনার রেখা ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে গাঢ় স্বরে বলল,

—সে সব কিছুই আমি চাইনে! আমি তোমাকে শুধু এই কথাই জানাতে এসেছি,—নিজের কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে চিরদিনের জন্য আমি বিদায় হব। তিনি আমাকে ত্যাগ করতে চাইবেন না, জানি, কিন্তু আমি নিজের স্বার্থের জন্য তাঁকে অনন্ত দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রব না। আমি তাঁকে মুক্তি দেব।...আমাকে বিশ্বাস কর বোন!

আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। তার পর অবজ্ঞাভরে বললাম,—তোমার দয়ার দান দুহাত পেতে নেব, এত বড় দুর্ভাগ্য এখনও আমার হয় নি! তুমি যদি না যাও, তবে আমাকেই এ ঘর থেকে যেতে হবে—

বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। প্রভা আমার পথরোধ করে ব্যাকুল-ভাবে বলল,—তাঁর উপর অবিচার করো না, আমি তাঁর মন জানি,

সেখানে তুমি ছাড়া আর কারু স্থান নেই। আমার উপর তাঁর যে দয়া, সে শুধু তাঁর কর্ত্তব্যের দায়! সেই কর্ত্তব্যের কাছে যে হৃদয়কে বলি দিতে হচ্ছে, তাঁর মনের এই গভীর বেদনা কে বুঝবে? তুমিও যদি বুঝতে না চাও, অভিমানে তাঁকে দূরে ঠেলে দাও, তবে কে তাঁকে আশ্রয় দেবে? বড় দুঃখী, বড় অসহায় তিনি!

আমার হৃদয় হাহাকার করে উঠল। আত্মসম্বরণ করতে না পেরে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি এই নিদারুণ ব্যথা বুকে পুষে সে তিলে তিলে আত্মবিসর্জ্জন করছে? আমাকে কি সে এখনও ভালবাসে,—আমারই জন্য তার সমস্ত হৃদয় উন্মুখ—অধীর?

প্রভা আমার শয্যাপার্শে বসে ধীরে ধীরে আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগল। আমি বাধা দিলাম না, সামান্য নার্স হলেও ওর হৃদয় তো ছোট নয়! নিজের স্বার্থ যে এমন ভাবে ত্যাগ করতে পারে, সাতরাজার ধন মাণিক হাতে পেয়েও এমন করে অনায়াসে বিলিয়ে দিতে পারে, সে তো সাধারণ নারী নয়!

প্রভা কিছুক্ষণ পরে বিষাদক্লিষ্ট স্বরে বলল,—তোমার সঙ্গে এই আমার প্রথম ও শেষ দেখা, ভাই। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার মত আপনার জন জগতে আর আমার কেউ নেই। তাই যে-গোপন কথা কাউকে বলিনি, তোমাকে আজ তা বলব।···আমি তাঁকে ভালবেসেছিলাম, আমার অবাধ্য মনকে আমি বশে রাখতে পারি নি।··কিন্তু ভাল বেসেছিলাম বলেই তাঁকে আমি দুঃখ দিতে পারব না, আমার অভিশাপগ্রস্ত জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে তাঁর জীবনও ব্যর্থ করে দেব না। যে তাঁর মর্য্যাদা বুঝে,

যাকে পেলে তাঁর জীবন সার্থক হবে, তার হাতেই তাঁকে দিয়ে যাচ্ছি। জীবনে অনেক ভুল করেছি, কিন্তু এখানে আমার কোন ভুল হয়নি।...

প্রভা কখন যে উঠে চলে গেছে, আমি তা জানতেও পারিনি। কতকটা মোহাচ্ছন্নের মতই পড়েছিলাম, আমার হৃদয়ের মধ্যে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব চলছিল। একটু পরে মাথা তুলে যখন চাইলাম, দেখলাম প্রভা নেই! হায়, তাকে যে আমার শেষ কথাটা বলা হয় নি, আমার মাথার উপরে সে যে ভার চাপিয়ে দিয়ে গেল, আমি যে তাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলাম।...এখনো তার কথাগুলো আমার কাণে বাজছে—বড় দুঃখী বড় অসহায় তিনি, তুমিও যদি মিথ্যা অভিমানে তাঁকে দূরে ঠেলে দাও, কে তাঁকে আশ্রয় দেবে? প্রভা—প্রভা, আমাকে একি কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়ে তুমি সরে দাঁড়ালে!

দূরে তখন সানাইয়ে মিলন রাগিণী বাজছে,—একটা অস্পষ্ট হাস্য-কলরব, আনন্দের ঢেউ আমারই ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে! ··এখনই বুঝি ওরা গায়ে হলুদ দেবার জন্য দল বেঁধে এখানে আসবে। অসহ্য—এ অসহ্য! আমাকে ঘিরে এই লজ্জাকর প্রহসন, কিছুতেই আমি আর হতে দেব না, এই মিথ্যার ঠাট ভেঙ্গে ফেলতেই হবে!···

বিমান ও শীলা

প্রভার কাছে বিদায় নিয়ে বিমান যখন রাত্রে বাড়ী ফিরল, তার মনে হল, তার উপর দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণাবাত্যা বয়ে গেছে। বিয়ের কল্পনায় তরুণদের মনে আনন্দের জোয়ার বয়, আকাশে বাতাসে তার কাণে উৎসবের বাঁশী বাজে, আত্মীয়স্বজন বন্ধু সকলকে সে আনন্দের ভাগ দিতে চায়। দুই তরুণহৃদয়ের মিলন—নবীন সৃষ্টির সূচনা—সংসারের নূতন অধ্যায়। কিন্তু তার এই বিবাহ—এ যেন ঠিক প্রাণ-দণ্ডের আদেশ—এ তার হৃদয়কে মুহ্যমান করে ফেলছে, পলে পলে অসহায় নিরুপায় ভাবে সে যেন সেই মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করছে! অন্তরের অন্তঃস্থল পরীক্ষা করে সে দেখল,—এর মধ্যে না আছে আশা, না আছে আনন্দ, তার সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করে আছে কেবল একটা নৈরাশ্যের অন্ধকার ;—গভীর অতলস্পর্শী সে অন্ধকার—সীমা নেই—শেষ নেই!

বিমান দেহটাকে কোনরকমে টেনে নিয়ে, বাইরের ঘরের একটা খাটের উপরে শুয়ে পড়ল। সুইচ টিপে আলো নিবাতে যাচ্ছিল,—এমন সময় মিছির এসে ঘরের ভিতরে দাঁড়াল। উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে বিমানের দিকে চেয়ে বলল,

—তোমার কি কোন অসুখ করেছে, খোকাবাবু?

বিমান অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল—না—

মিছির একটু চুপ করে থেকে বলল,—তাহ'লে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বস। দেরী করলে খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তুমি না খেলে মাইজীও তো মুখে জলটুকু দেবেন না, ঠায় বসে আছেন তোমার জন্য—

একটু বিরক্তভাবেই বিমান বলল,—আমি কি দশ বছরের খোকা নাকি? মাকে বল, আমি আজ আর কিছু খাব না।

মিছির গেল না, নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

তার ভাব দেখে বিমান বলল,—আবার কি?

মিছির মাথা চুলকিয়ে বলল,—তুমি নিজে গিয়ে মাইজীকে বললেই ভাল হয়, খোকাবাবু—

—না—না, আমি যেতে পারব না, তুমিই বলগে মিছির-জী!

মনের এই অবস্থা নিয়ে মার সামনে দাঁড়াতে বিমানের ভয় হচ্ছিল। বুদ্ধিমতী মা যদি তার মনের ভাব ধরে ফেলেন—যদি—

কিন্তু বলতে তো হবেই,—কতক্ষণ আর সে লুকিয়ে রাখতে পারবে! হয়ত নিজে থেকে না বললেও, কথাটা আর এক দিক দিয়ে কালই রাষ্ট্র হয়ে যাবে, মার কাণেও পৌছবে!

সে কথা শুনলে মার মনের যে ভীষণ অবস্থা হবে, বিমান তা কল্পনা করতেই শিউরে উঠল। তার নিষ্ঠাবতী আচারপরায়ণা মা, বনিয়াদী বংশের কুলবধূ—কুলধর্ম্ম, বংশমর্য্যাদার কাছে, জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্যও যিনি তুচ্ছ মনে করেন,—তিনি যখন শুনবেন, তাঁর একমাত্র পুত্র একজন হাসপাতালের নার্সকে বিয়ে করছে, সেও আবার বিধবা—তখন তাঁর মনের অবস্থা কেমন হবে! এই প্রচণ্ড আঘাত খুব সম্ভব তিনি সহ্য

করতেই পারবেন না,—বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত সেই নিদারুণ সংবাদে তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে! বিমান হবে মাতৃহন্তা! পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞায় মাকে বধ করেছিলেন,—আর বিমান কিসের জন্য এই ভীষণ অপরাধ করবে?

না—না, বিমান কখনই নিজমুখে মাকে এ কথা বলতে পারবে না! যতক্ষণ সম্ভব,—শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁর কাছে গোপনই রাখতে হবে!

বিমানের মা সকালবেলা বসে মালাজপ করছিলেন। বিমান কাছে যেতেই বললেন,—এইবার আমার কাশী যাওয়ার ব্যবস্থাটা করে দাও, বাবা,—বিশ্বনাথের চরণছাড়া হয়ে আর কতদিন থাকব?

মার মুখের দিকে চেয়ে কোন উত্তর দিতে বিমানের সাহস হল না—অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে নীরব হয়েই রইল।

ছেলের ভাব দেখে মা অভিমানাহত স্বরে বললেন,—থেকে আর কি হবে বাবা! শেষজীবনে আমার যে একমাত্র সাধ ছিল,—উপযুক্ত ছেলে থাকতেও তা তো পূর্ণ হল না!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁর মর্ম্মস্থল ভেদ করে বেরিয়ে এল, নীরবে তিনি মালাজপ করতে লাগলেন। বিমান হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে মা পুনরায় বললেন,—সংসারের মায়া যেমন ছাড়তে পারিনি, বিশ্বনাথ তেমনি আমাকে শাস্তি দিয়েছেন। যাকে বৌ ক'রে ঘরে আনব বলে এতকাল ধ'রে মনে মনে আশা করেছি,—সে আজ চিরদিনের মত আমার কাছে পর হয়ে গেল।…তুই বোধ হয় শুনিস্ নি, শীলার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, সেই ব্যারিষ্টার ছেলেটীর সঙ্গে। অমন রূপে-লক্ষ্মী, গুণে-সরস্বতী—ও মেয়ে যাদের ঘরে যাবে, তাদের সৌভাগ্য!

বিমান কাষ্ঠহাসি হেসে বলল,—সকলের ভাগ্য তো সমান নয় মা!

কিন্তু বিমানের বুকের ভিতর যেন হাহাকার করতে লাগল।…সেতো স্বেচ্ছায় এই সৌভাগ্য পায়ে ঠেলেছে! লক্ষ্মী স্বয়ং তাকে জয়মাল্য পরিয়ে দিতে এসেছিলেন, সেইতো মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। হায়, তার শীলা,—তার আবাল্যবন্ধু, শিষ্যা—তার একমাত্র অনুরাগের পাত্র, যাকে ঘিরে সে চিরদিন জীবনের স্বপ্নজাল বুনেছে, সেই আজ অন্যের গৃহলক্ষ্মী হবে,—এও তাকে শুনতে হল! বিমানের শিরায় শিরায়, মর্ম্মের কোষে কোষে—প্রত্যেক রক্তকণিকার মধ্যে এখনও যে তার স্মৃতি! তার চাহনি, তার হাসি, তার কলকণ্ঠের সঙ্গীতময় স্বর,—এখনও সে যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারছে!…কে তার এই অন্তরের হাহাকার, গভীর মর্ম্মব্যথা বুঝবে?

আর শীলা! এ আঘাতে তার বুক বোধ হয় ভেঙ্গে যাবে। শীলা যে শেষ পত্রখানা তাকে লিখেছিল, হঠাৎ তার কথা বিমানের মনে পড়ল। কি করুণ, কি মর্ম্মন্তুদ বেদনায় ভরা তার সেই পত্র! একটীবার তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য কি ব্যাকুলভাবে সে আহ্বান করেছিল,—কিন্তু বিমান এমন নিষ্ঠুর যে, সেই চরম আহ্বানও উপেক্ষা করেছে। না-ক'রে যে, তার উপায় ছিল না! শীলার সামনে কেমন ক'রে সে গিয়ে দাঁড়াত, তার অশ্রুসজল দৃষ্টি, উদাস মলিন মুখ—কি ক'রে সে সহ্য করত! পত্রখানা পরম দুঃখের স্মৃতিরূপে সে চিরদিন রক্ষা করবে ভেবেছিল, কিন্তু কোথায় সেখানা ফেলে দিয়েছে, এমনই আত্মবিস্মৃতি তার! নিজের উপরে বিমানের বড় রাগ হল!

…একমাত্র সান্ত্বনা কর্ত্তব্যের কাছেই সে প্রেমকে বলি দিতে যাচ্ছে! অসহায়া অপমানিতা নারীকে নিদারুণ লজ্জা ও অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাতে নিজের সুখ সে বিসর্জ্জন দিচ্ছে। জগতে এইতো সবচেয়ে বড় কথা,—মানবসমাজের যাঁরা শিরোমণি, তাঁরা এমনই আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গিয়েছেন! নিজের কামনা পূর্ণ করবার জন্য সকলেই তো ব্যস্ত, কিন্তু কে পরের জন্য নিজের বাসনা ত্যাগ করতে পারে? বিমান সেই দুঃসাধ্য দুঃখের ব্রতই বরণ করে নিয়েছে!

একটা আত্মগৌরবের তৃপ্তিতে বিমানের মন পূর্ণ হল। কিছুক্ষণ আগেই যে নৈরাশ্যের বেদনা তার মন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল, এই নূতনভাবের বন্যায় তা কতকটা প্রশমিত হল। পরক্ষণেই অন্তরের কোন গভীর স্তর থেকে কে যেন বলল,—আত্মত্যাগের গৌরবে নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে তুমি তৃপ্ত,—কিন্তু শীলার কি? সে কার মুখ চেয়ে এই পরমদুঃখ বরণ করে নেবে? বিমানের মন এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারল না, দিতে সাহসও করল না!

পুত্রের চিন্তাকুল অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করে মা বললেন,—আমি আর ওদের বাড়ীতে মুখ দেখাতে পারব না,—সেইজন্যই আরও তাড়াতাড়ি কাশী যেতে চাইছি।

বিমানের একবার ইচ্ছাহল, সে বলে,—তোমার ছেলেও আইবুড়ো থাকবে না মা, বৌ একটী শীগ্‌গিরই ঘরে আসবে;—কিন্তু কিছুতেই সে-কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে তার সাহস হল না। এই ব'লে সে নিজের মনকে বুঝাতে চেষ্টা করল, যে, মা কাশী গেলেই বরং ভাল,—তাঁর চোখের উপর এ বিয়ে সে করতে পারবে না। বিয়ের পর গিয়ে, মার

কাছে সে ক্ষমা ভিক্ষা করবে, স্নেহময়ী মা তখন কিছুতেই তাকে পায়ে ঠেলতে পারবেন না।

মুখে বিমান শুধু বলল,—তোমার যা ভাল লাগবে, তাই কর মা—

মা পুত্রের দিকে চেয়ে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন।

*

*   *

আজ সকালে প্রভা তার শেষকথা জানাবে। আজই তাদের জীবনের এক নূতন অধ্যায় স্বরু হবে, ভবিষ্যতের অজ্ঞাত তিমিরগর্ভে কি আছে, কে বলতে পারে? গাড়ীতে বসে বিমান যখন প্রভার বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল, তখন তার মনে হল, তার নিজের কোন ইচ্ছাশক্তি নাই, কোন এক নিষ্ঠুর নিয়তি জোর ক'রে তাকে দুর্গম পিচ্ছিল পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে! তার বুক দুরু দুরু কাঁপছিল,—জগতের কোন কিছুকে যে কোনদিন ভয় করেনি, আজ তার একি দুর্ব্বলতা? একবার তার মনে হল, প্রভা যদি মত পরিবর্ত্তন করে, এ বিয়েতে শেষ পর্য্যন্ত সম্মত না হয়, তা হলে সে মুক্তি পায়। কিন্তু পরক্ষণেই অবাধ্য মনকে চোখ রাঙিয়ে সে শাসন করল,—কর্ত্তব্যই জগতে সব চেয়ে বড় জিনিষ, তুচ্ছ তার কাছে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ!

প্রভার বাড়ীর দরজার সামনে গিয়ে সে একটু বিস্মিত হল,—কেমন যেন তার মনে হল,—বাড়ীটা পরিত্যক্ত শ্রীহীন, সেখানে কেউ নাই, তার আকাশে বাতাসে একটা শূন্যতার ভাব! ফটক পার হয়ে, ভিতরের

দরজার কাছে গিয়ে দেখল, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। সে কয়েকবার জোরে কড়া নাড়ল, প্রভার নাম ধ'রে ডাকল, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। বিমান খুব আশ্চর্য্য হল। প্রভা কোথায় গেল,—হাসপাতালে? কিন্তু এখন তো তার যাবার কথা নয়, বিমান যে এই সময়েই আসবে তার জানা ছিল। তবে কি···বিমানের মনে ঘোর সন্দেহের উদয় হল। হতাশ হয়ে সে ফিরে আসবে ভাবছে, এমন সময়ে দরজা সহসা খুলে গেল। কিন্তু যে বেরিয়ে এল, সে প্রভা নয়—ধাত্রী গিরিবালা। বিমান লক্ষ্য ক'রে দেখল, গিরিবালার মুখ মলিন, বিষণ্ণ, চোখদুটী জলভরা মেঘের মত অশ্রুভারাক্রান্ত।

বিমান অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করল,—প্রভা—প্রভা কোথায়?

গিরিবালা ধরা গলায় উত্তর দিল—নাই!

তার স্বর যেন কান্নারই রূপান্তর!

বিমান সভয়ে দুহাত পিছিয়ে গিয়ে বলল,—নাই? সে কি?

বিদ্যুৎচমকের মত বিমানের মনে হল, বুঝি কিছু একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটেছে,—বুঝি প্রভা—

বিমান আর চিন্তা করতে পারল না।

গিরি তার মনের ভাব বুঝে বলল,—শেষ রাত্রে তিনি বাড়ীথেকে কোথায় চলে গেছেন,—আমি জানতেও পারি নি। তাঁর খাটের উপর এই চিঠিখানা পড়েছিল। চিঠি আমি খুলি নি,—অনুমানেই বুঝছি, কিছু একটা বিপদ ঘটেছে। কাল রাত্রে আমাকে বলছিলেন,—গিরি, এ সব আর আমার ভাল লাগছে না,—ইচ্ছা হচ্ছে, এমন জায়গায় চলে যাই যেখানে তোমরা কেউ আমাকে খুজে পাবে না!

বালির বাঁধ

গিরির কথা শোনবার মত ধৈর্য্য বিমানের ছিল না। সে কম্পিত হস্তে পত্রখানা খুলে ফেলে পড়ল :—

বিমান বাবু,

শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই পারলাম না, মন আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আমাকে ক্ষমা করবেন।

এই হতভাগিনীর জন্য আপনি সর্ব্বস্বত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হন নি,—মানসম্ভ্রম কুলগৌরব,—এমন কি আবাল্যের ভালবাসা, তুচ্ছ এই নারীর জন্য সবই আপনি বিসর্জ্জন দিতে চেয়েছিলেন। সে ঋণ এজন্মে শোধ করতে পারলাম না, কোন জন্মে পারব কি না, বিধাতাই জানেন।

সবই আমি জানতে পেরেছি। যাঁর অমূল্যনিধি চোরের মত আমি হরণ করতে চেয়েছিলাম, তাঁরই হাতে ও জিনিষ ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। তিনিই এর মর্য্যাদা রাখতে পারবেন।

আমি নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলাম। এ বিশাল পৃথিবীতে আমার একটা স্থান হবেই। যে-সেবাব্রতে আপনার কাছেই দীক্ষা নিয়েছি, বাকী জীবনটা যেন সেই ব্রতই পালন করতে পারি। তার চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা আমার আর কিছুই নেই।

আমার শেষপ্রার্থনা, আপনি আমার কোন খোঁজ করবেন না, করলেও পাবেন না। ধুমকেতুর মত আমি আপনাদের দুজনের মধ্যে এসেছিলাম, ধুমকেতুর মতই চিরদিনের জন্য সরে গেলাম। আপনারা দুজনে সুখী হন, তা হলেই আমি তৃপ্ত হব।

'প্রভা'

বালির বাঁধ

বিমান চিঠি পড়ে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারল না, এ প্রভার চিঠি। সে দুই তিন বার .করে চিঠিখানি পড়ল, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গিরির দিকে চেয়ে বলল,

—সে চলে গেছে, আর ফিরে আসবে না। আমি মনে মনে আত্ম-ত্যাগের গর্ব্ব করেছিলাম, কিন্তু সে আমাকে পরাস্ত করেছে।

গিরি আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বল্‌ল,—বড় হতভাগিনী সে ডাক্তার বাবু! রাণীর ঐশ্বর্য্য পেয়েও জীবনে সে সুখী হতে পারে নি, আজ আবার স্বেচ্ছায় বিপদসাগরে ঝাঁপ দিল!

পরাজিত রণশ্রান্ত সৈনিকের মত বিমান গৃহে ফিরল। তার সব আশা সাধ চূর্ণ হয়ে গেছে, জীবনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে—সে আজ সকল রকমেই ব্যর্থকাম। কৈশোরের প্রেম নিজের হাতেই সে বিসর্জ্জন দিয়েছে। তার অন্তরলক্ষ্মী বরণডালা সাজিয়ে যখন সামনে এসে দাঁড়াল, সে তাকে নির্ব্বোধ হৃদয়হীনের মত প্রত্যাখ্যান করল। আর যার জন্য সে সমস্তই ত্যাগ করতে চেয়েছিল, হাসিমুখে দুঃখকে বরণ করে নিয়েছিল,—সেই প্রভা অনায়াসে তাকে উপেক্ষা করে চলে গেল। বিমান আজ অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, সর্ব্বহারা, ভিখারী। এ জগতে তার কেউ নাই, জীবন তার কাছে শূন্য মরুভূমি। এ আঘাত সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। একদিকে শীলা, অন্যদিকে প্রভা, উভয়েরই স্মৃতিই অভিশাপের মত তাকে অনুসরণ করবে, অনুক্ষণ তুষানলে তার হৃদয় দগ্ধ করতে থাকবে।

এই স্মৃতির দাহ থেকে মুক্তি পেতে হলে পলায়ন ছাড়া অন্য কোন পথ তার নেই!

বাড়ী ফিরে বিমান মাকে বলল,—তোমাকে কাশী রেখে কিছুদিন বিদেশে ঘুরে আসব মা। শরীরটা ভাল নেই, দেশে থাকতেও আর মন লাগছে না!

মা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

—যাতে তুমি ভাল থাক, তাই কর বাবা, আমার আর কিছু বলবার নেই। তবে একমাত্র ছেলে তুমি, কোন ম্লেচ্ছ দেশে গিয়ে জাতধর্ম্ম খোয়াবে এ যেন দেখতে না হয়!

বিমান ম্লান হেসে বলল,—তোমার এ অকারণ ভয় মা। আজকাল কত ছেলেই তো ম্লেচ্ছদেশে যাচ্ছে, সকলেই কি আর জাতধর্ম্ম খোয়ায়! আমার জন্যও তুমি কিছু ভেব না।

মা আর কিছু না বলে মালাজপে মন দিলেন। কিন্তু একটা তীব্র বেদনা থেকে থেকে তাঁর মর্ম্মস্থল ভেদ করে উঠতে লাগল।

*

* *

আজ বিমানের কলিকাতা ত্যাগ করবার দিন। মাকে কাশী রেখে সে সোজা বোম্বাই চলে যাবে, এই ব্যবস্থা করেছে। কোথায় যাবে, কবে ফিরবে, তার ঠিক নেই,—হয়ত দেশে আর না ফিরতেও পারে। ভাল ভাল আসবাব পত্র, মূল্যবান বই, ডাক্তারী যন্ত্রপাতি—বন্ধুবান্ধবদের দিয়ে যাবে, কেবল দুচারটা একান্ত প্রিয় জিনিষ স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ সঙ্গে রাখবে। শীলা প্রথম সেলাই করতে শিখে, তাকে নিজের হাতে বোনা যে সব জিনিষ উপহার দিয়েছিল, সেগুলি সে ফেলে যেতে পারবে না। একবার বাবার সঙ্গে আগ্রায় বেড়াতে গিয়ে শীলা তার জন্য একটী সাদা পাথরের 'তাজমহল' নিয়ে এসেছিল। সলজ্জ হেসে বলেছিল—এর চেয়ে ভালবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন জগতে আর নেই!

বিমান উত্তর দিয়েছিল,—কিন্তু শীলা, এযে বিরহের স্মৃতি—কবির ভাষায় প্রেমের জমাট অশ্রু!

শীলা গম্ভীরভাবে বলেছিল,—বিরহই তো প্রেমকে পূর্ণতা দেয়!

আজ সেই কথা মনে করে বিমানের অন্তর তীব্র বেদনায় ভরে

উঠল। কি অশুভক্ষণেই শীলার মুখ দিয়ে ঐ কথাগুলি বেরিয়েছিল,—ভবিষ্যৎবাণীর মত তাই তাদের জীবনে শেষে সত্য হয়ে উঠল! বিমানের ইচ্ছা করতে লাগল, অমঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ তাজমহলটা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলে,—কিন্তু কিছুতেই তা করতে পারল না। অবশেষে স্থির করল, চির বিরহের স্মৃতির মত, প্রেমের জমাট অশ্রুর মত, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ওটা সঙ্গেই রাখবে।

ফটোর আলবাম দেখতে দেখতে কতরকম ছবিই বেরল,—তার নিজের নানা রকমের, বন্ধুবান্ধবদের, শীলার। একটা ছবি শীলার চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তোলা। শীলার বয়স তখন ষোল সতের বৎসর। খড়দহের কাছে একটা বাগানে তারা চড়ুইভাতি করতে গিয়েছিল—সেইখানেই ছবিটা তোলা। শীলা একটা বকুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে,—তার বনদেবীর সাজ,—সর্ব্বাঙ্গে ফুলের অলঙ্কার, মাথায় ফুলের মুকুট, পরণে একখানি সবুজ রঙের শাড়ী—চারিদিকের সবুজ রঙের সঙ্গে যেন মিলে গিয়েছিল। ছবি তোলা হলে বিমান বলেছিল,—এই ছবি খানিতেই তোমার আসল মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে, শীলা। এ ছবি আমি আর কাউকে দেব না, তোমাকেও না—নিজের কাছে সযত্নে রেখে দেব!

শীলা দুষ্টামির হাসি হেসে বলেছিল,—তুমি তো বড় স্বার্থপর বিমান-দা, আমার জিনিষ তুমি অন্যায় করে বেদখল করতে চাও!

—আমি যে স্বার্থপর, সে অপবাদ মেনে নিচ্ছি,—কিন্তু ছবি আমি কাউকে দেব না।

শীলা কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বলেছিল,—আর কখনো আমি ছবি তুলব না!

আজ সেই সব কথা একটী একটী করে বিমানের মনে পড়ল,—আর তার মর্ম্মের গ্রন্থিগুলা যেন ব্যথায় টন টন করে উঠল। ছবিখানি তেমনি আছে, একটুও দাগ পড়েনি, বিবর্ণ হয়নি—যেন এই মাত্র তোলা। শীলার সেই বড় বড় চোখ, রহস্যময় দৃষ্টি, নিটোল কপোল, দুষ্টামির হাসিভরা অধর! দেখতে দেখতে বিমানের বোধ হল, স্বয়ং শীলাই তার সামনে দাঁড়িয়ে,—তার দুই চোখের রহস্যময় দৃষ্টি যেন বিমানের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত ভেদ করছে,—যেন সে বলছে, এই তোমার প্রেম,—এরই এত গর্ব্ব করেছিলে তুমি! পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও আমি তোমাকে ভুলতে পারব না,—আর তুমি…

বিমানের ইচ্ছা হল, সে বলে, ওগো ভুলি নি, আমিও তোমাকে একটুও ভুলি নি—ভোলবার সাধ্য আমার নেই,—আগুনের অক্ষরে তোমার কথা যে আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে লেখা আছে।…তুমি তো বুঝবে না শীলা, কি তুষানলে আমার অন্তর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে—কেমন করে বোঝাব তোমাকে!

বিমান দুইহাতে মাথা গুঁজে অসাড় নিস্পন্দবৎ বসে রইল,—বাহ্যজগৎ যেন তার কাছে লুপ্ত হয়ে গেল!

কতক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। হঠাৎ কার লঘু পদশব্দে তার চমক ভাঙ্গল—চোখ চেয়ে সম্মুখে যা দেখল, তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে সাহস হল না। সে কি স্বপ্ন দেখছে,—শীলার ছবি দেখতে দেখতে তার কি মতিভ্রম ঘটেছে? দুহাতে চক্ষু মার্জ্জনা করে ভালকরে সে দেখল,—ঠিক সেই মূর্ত্তিই তো! তবে কি—

শীলা বলল,—আমি এসেছি—

বিমানের মনে হল এ যেন শীলার কণ্ঠস্বর নয়,—দূর অতিদূর থেকে আর কারু স্বর বাতাসে ভেসে আসছে! কিন্তু কি করে শীলার সামনে মুখোমুখী হয়ে সে দাঁড়াবে—তার দিকে চেয়ে কথা বলবে? বিমান যে অপরাধ করেছে, তার তো প্রায়শ্চিত্ত নেই!

শীলা বলল,—আমার সঙ্গে কথাও কি বলবে না? শুনলাম, দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছ,—সত্যি না কি?

শীলার কণ্ঠস্বর ব্যথায় ভরা! বিমান বুঝল, শীলা সব শুনেছে। মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বলল,—হাঁ, সত্যি!

—কেন?

বিমান কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বলল,—এদেশে থাকতে আমার আর ভাল লাগছে না বলে—

শীলার বুক ফেটে কান্না আসতে লাগল। উদ্গত অশ্রু রোধ করে সে বলল,—কোথায় যাবে?

—ঠিক কিছু নেই, আমার এ নিরুদ্দেশ যাত্রা! লক্ষ্যহীন তরণীর মত যে দিকে ইচ্ছা ভেসে যাব, কোন ঘাটে গিয়ে ভিড়ব, আগে থেকে তাতো বলতে পারি নে—

—ফিরবে কবে?

—তাও বলতে পারি নে,—হয়ত আর না ফিরতেও পারি!

শীলা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল,—নিজের জীবনটাকে এ ভাবে নষ্ট করে লাভ কি?

—নষ্ট কিছুই হয় না, শীলা। হয় ত এই লক্ষ্যহীন নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্যেই শান্তি পাব।

শীলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,—দেশ ছেড়ে যেতে একটুও কি মমতা হচ্ছে না, কোথাও কি কোন বন্ধন অনুভব করছ না ?

বিমান ধীরে ধীরে বলল,—সে সব অতীতের কথা তুলে কাজ নেই শীলা। দীপ যখন নিবে যায়,—তখন থাকে কেবল ধোঁয়া। অন্ধকারে সেই ধোঁয়া আগলে বসে থেকে লাভ কি ?

শীলা বিমানের মুখের উপর দুই আয়ত চোখের পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করে বলল,—কিন্তু আমি যদি বলি,—প্রয়োজন আছে, আবার দীপ জ্বালবার জন্য। দমকা বাতাসে দীপশিখা যদি একবার নিবেই গিয়ে থাকে, চিরদিনের মত হতাশ হবার কারণ নেই।

বিমান ম্লান হেসে বলল,—এসব তোমার কাব্যের কল্পনা। কিন্তু জীবনটা শুধু কাব্য নয়, নিষ্ঠুর বাস্তব পদে পদে এখানে বাধা দেয়।

—কাব্য নয়, বাস্তবের কথাই বলছি। যদি বলি, আমি তোমাকে যেতে দেব না—

—তুমি !

বিমানের কণ্ঠ থেকে বিস্ময়সূচক স্বর নির্গত হল।

—হ্যাঁ, আমিই ! আমার কি কোন দাবীই নেই তোমার উপর ?

বিমান নিঃশ্বাস ফেলে বলল,—এত বড় দাবী আর কারু ছিল না শীলা। কিন্তু দুদিন বাদে তোমার জীবনে আর এক নূতন অধ্যায় সুরু হবে। এ সব পুরাণো দাবীর কথা ভুলে যাওয়াই কি ভাল নয় ?

শীলা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বলল,—ও, বুঝেছি ! কিন্তু সে অধ্যায় আমি সূচনাতেই শেষ করে দিয়েছি,—স্পষ্ট করে বলেছি, মিথ্যাকে বরণ করে আত্মহত্যা আমি করতে পারব না।

বালির বাঁধ

বিমান আর্ত্তকণ্ঠে বলল,—কেন একাজ করলে শীলা? সব কথা তুমি জান না,—জান না আমি কত হীন, তোমার ভালবাসার অযোগ্য! আমি যে দেশ ত্যাগ করতে চাইছি;—সেই আমার উপযুক্ত শাস্তি!

শীলার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল, বেদনাহত কণ্ঠে সে বলল,—সবই আমি জানি, আর জানি বলেই আমার মনের কোন কোণে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। সূর্য্যকে কুয়াশায় ঢেকে ফেলতে পারে, কিন্তু সে কুয়াশা কাটতেও বেশী সময় লাগে না।

বিমান দুই হাতে মুখ ঢেকে বলল,—কিন্তু আমি তো নিজকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না শীলা, অতীতের কলঙ্কের গ্লানি কিছুতেই ভুলতে পারব না!

শীলা বিমানের একহাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল,—যাতে ভুলতে পার সেই হবে আমার জীবনের ব্রত। যেখানে তুমি যাবে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব, কিছুতেই তোমাকে একলা ছেড়ে দেব না—

বিমান মুখ তুলে শীলার দিকে চাইল, দেখল শীলার দৃষ্টিতে গভীর অপরিমেয় মমতা—আত্মত্যাগের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য!

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস ঃ—

অনাগত—১৷৷০

ভ্রষ্ট লগ্ন—১৸০

বিদ্যুৎ লেখা—২৲

লোকারণ্য—২৷৷০

জীবন চরিত ঃ—

শ্রীগৌরাঙ্গ—১৷৷০

কলিকাতার সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।